বৈষ্ণব কবিতা

দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিশ্লেষণ

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
অধ্যাপক, বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য-বিভাগ
হিন্দু কলেজ, গোবরডাঙ্গা



এস্ ব্যানার্জী এণ্ড কোং
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট • কলিকাতা ৯

॥ প্রকাশক ॥

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,

কলিকাতা-৯

॥ পরিবেশক ॥

বামা পুস্তকালয়

১১-এ, কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা-১২

॥ মুদ্রাকর ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ পান

লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রেস

২০৯, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

॥ প্রচ্ছদপট ॥

শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত

॥ মূল্য ঃ তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা ॥

নিবেদন

বৈষ্ণব কবিতা মধ্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহার মধুর রসে এখনও বাঙ্গালীর মনপ্রাণ বিভোর। বৈষ্ণব কবিতা সাধারণতঃ সঙ্গীত-সুধার আকর বলিয়াই জনসমাজে আদৃত। ইহার কাব্যমূল্য বা দার্শনিক ও ধর্মনীতিক ভিত্তি সম্পর্কে সকলে সচেতন নহেন। অথচ এক বিশিষ্ট দার্শনিক ও ধর্মীয় তত্ত্বকেই বৈষ্ণব কবিতায় রূপ দেওয়া হইয়াছে। অপরূপ কাব্য-সম্পদে সমৃদ্ধ বৈষ্ণব কবিতার রসাস্বাদন তত্ত্বকে বাদ দিয়াও সম্ভব সন্দেহ নাই; কিন্তু তত্ত্বের পটভূমিকায় এই কবিতাগুলি আস্বাদন করিলে তবেই উহাদের যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। অবশ্য তত্ত্বের অত্যধিক কচ্‌কচি কাব্যরস আস্বাদনের বিঘ্নও ঘটায়। এই গ্রন্থে বৈষ্ণব কবিতার সম্যক রসাস্বাদনের পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন তত্ত্ব-বিশ্লেষণ যাহাতে সেই সীমা অতিক্রম না করে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

বৈষ্ণব সাহিত্যের তিনটি ভাগ—(১) বৈষ্ণব কবিতা, (২) কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য, (৩) চৈতন্য-জীবনী কাব্য। এই গ্রন্থে বৈষ্ণব কবিতার আলোচনাই সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' সংগ্রহ গ্রন্থ এই আলোচনার জন্য অবলম্বন করিয়াছি। বৈষ্ণব পদাবলী বি.-এ. স্পেশ্যাল বাঙ্গলা এবং বাঙ্গলা অনার্সের জন্য অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ। এই বিষয় পাঠেচ্ছু ছাত্রদের প্রয়োজনের দিকটির প্রতিই সর্বাধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থের পরিকল্পনা সম্পর্কে মুরলীধর গার্লস্ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। গ্রন্থে আলোচিত দার্শনিক তথ্য সম্পর্কে গোবরডাঙ্গা হিন্দু

কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক সহকর্মী শ্রীযুত কিরীটিভূষণ দত্তের মূল্যবান আলোচনা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিতেছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুত প্রণবরঞ্জন ঘোষের কল্যাণেই বৈষ্ণব কবিতা সম্পর্কে প্রথম মনে আগ্রহের সঞ্চার হয়। বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে বন্ধুবরের প্রগাঢ় জ্ঞান, রসানুভূতি এবং তাঁহার বৈষ্ণবসুলভ নিষ্কাম বন্ধুপ্রীতির কথা স্মরণে রাখিয়া এই গ্রন্থখানি তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া গভীর সন্তোষ বোধ করিতেছি। ইতি—

ডিসেম্বর, ১৯৫৯ সাল
হিন্দু কলেজ
গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

অধ্যাপক শ্রীযুত প্রণবরঞ্জন ঘোষ

করকমলেষু

॥ বিষয়-সূচী ॥

বৈষ্ণব কবিতা পাঠের ভূমিকা

॥ ১ ॥

ধর্মসাধনা তথা ঈশ্বরোপাসনাকে ভিত্তি করিয়াই বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম উন্মেষ হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাহিত্যের জন্মলগ্নের ইতিহাসও মোটামুটি তাহাই। কিন্তু সাধন-পদ্ধতির এত বৈচিত্র্য এবং সাহিত্যে তাহার প্রতিফলন বোধহয় অন্য কোন দেশে এত বেশী হয় নাই। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত (পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ) বাঙ্গলাদেশে ধর্মসাধনার বহু বিচিত্র প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়—তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, শৈব ধর্ম, নাথ ধর্ম, সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়, বাউল সম্প্রদায় ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত মুসলমান শক্তির অত্যাচারে ও তান্ত্রিক বৌদ্ধদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে অসংখ্য দেব-দেবীর উদ্ভব ঐ সময়ই হইয়াছিল। ঐ সকল ধর্মসাধন-পদ্ধতির প্রত্যেকটিকে কেন্দ্র করিয়াই সাহিত্য রচিত হইতে দেখা যায় এবং ইংরাজ আমল পর্যন্ত এই সাহিত্যের স্রোত প্রায় অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হয়।

তান্ত্রিক বৌদ্ধদের রচিত চর্যাপদ, শৈবদের অন্নদামঙ্গল, কালিকা মঙ্গল, শিবায়ন, শাক্তগীতি, বৈষ্ণবদের রচিত পদাবলী, কৃষ্ণমঙ্গল, চরিত-কাব্য ইত্যাদি, নাথপন্থীদের গোর্খবিজয়, সহজিয়াদের সাধন-গীতি এইগুলিই অনাধুনিক যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের অর্থাৎ বাঙ্গলা কাব্যের প্রধান মূলধন। রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ ও কিছু কিছু প্রণয় গাথা ঐ যুগে রচিত হইলেও ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যের প্রাচুর্যই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আর রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদের মূলেও ধর্মীয় মনোভাবই সক্রিয় ছিল। বৈষ্ণবদের ভাগবতের অনুবাদের প্রেরণা হইতেই রামায়ণ-মহাভারত অনূদিত হয়।

প্রায় সাতশত বছর ধরিয়া রচিত বাঙ্গলা ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর স্থান নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। এক বিশেষ ধর্মনীতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই বৈষ্ণব কবিরা তাঁহাদের আশ্চর্য সুন্দর কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই কিন্তু তবুও এই কবিতাগুলি যে-ভাবে ধর্মীয় আবেদনের ঊর্ধ্বে রসপিপাসু হৃদয়কে উত্থিত করে তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। বৈষ্ণব কবিরা সকলেই মহাজন ছিলেন। কাজেই বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব ও দর্শন তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে এক বিশেষ তত্ত্বপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই তত্ত্বকেই তাঁহারা কাব্যের আধারে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন। এই জন্যই বৈষ্ণব কাব্যকে বৈষ্ণব-তত্ত্বের রসভাষ্য বলা যায়। আশ্চর্য হইতে হয় কিভাবে বৈষ্ণব কবিকুল তত্ত্বের নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়াও তাঁহাদের রচিত কাব্যকে তত্ত্বের অতীত অলৌকিক রসের বস্তুতে পরিণত করিয়াছেন। ধর্মসম্পৃক্ত বিষয় কাব্যের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, এই মত যে অভ্রান্ত নয়, বৈষ্ণব কবিরা তাহা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণ যে-ধর্মমতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহাকে সঙ্কীর্ণ ও অনুদার ধর্মমত বলিতে পারা যায় না। বৈষ্ণব ধর্মের উপাসনা-পদ্ধতি যাহাই হোক না কেন ইহা মূলতঃ প্রেমধর্ম। আর এই প্রেমধর্ম মানুষে মানুষে পার্থক্য স্বীকার করে না। এই ধর্মের মূল কথা হইল, 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' দ্বিজ ও চণ্ডালের প্রভেদ এই প্রেমধর্মের বন্যায় ভাসিয়া যায়। এই প্রেম শত্রু-মিত্র প্রভেদ মানে না। আঘাত করিলেও প্রত্যাঘাত না করিয়া এই ধর্ম প্রেমই বিতরণ করিতে চায়। ব্যক্তিগত সুখ বা পারলৌকিক মুক্তির কোন স্থান এই ধর্মে নাই। এই প্রেম আপনাকে বিলাইয়া, রিক্ত করিয়াই চরিতার্থতা লাভ করে। এই প্রেমের

অবতার, প্রেমের জীবন্ত বিগ্রহকে বৈষ্ণব কবিরা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। প্রেম তাঁহাদের কাছে কল্পনার বস্তু ছিল না, ইহা ছিল তাঁহাদের কাছে নিছক বাস্তব সত্য। তাইতো ধর্মভিত্তিক হইলেও তাঁহাদের কাব্যে সর্বজনীন আবেদন পুরামাত্রায় বিদ্যমান।

মধ্যযুগের বাঙ্গলা দেশে ভীতি ও স্বার্থবুদ্ধি হইতে সৃষ্ট দেবদেবী বা উপদেবীদের পূজা, নানাপ্রকার কুসংস্কার, জাত বাঁচাইবার জন্য সেই সকল কুসংস্কারের নিষ্ঠুর প্রকাশ প্রভৃতির মধ্যে উদার বৈষ্ণবধর্ম, বিশেষ করিয়া প্রেমাবতার গৌরচন্দ্রের আবির্ভাব বাঙ্গালী জাতিকে যে, নিদারুণ অধঃপাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল তাহাতে কোন সংশয় নাই। ঐ সকল দেবদেবীকে নিয়া যে-সকল মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে তাহাদের বিষয়বস্তু হইতেছে দেবতা বিশেষের মহিমা কীর্তন ও তাঁহার পূজা প্রচার। আর পূজা পাইবার জন্য ঐসকল দেবতাদের অশোভন আগ্রহ এবং রোষ, হিংসা, প্রতিহিংসা, নির্লজ্জ ছলনা তাঁহাদের দেবত্বকে কতটুকু মহিমান্বিত করিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

বৈষ্ণবধর্মের মূল কথা হইল এই যে, ভক্ত যেমন ভগবানকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল, ভক্তের জন্য ভগবানের ব্যাকুলতাও তাহার চেয়ে কোন অংশেই ন্যূন নহে। বৈষ্ণবধর্মে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক প্রেমাত্মক। কাজেই সেখানে ভগবান ছাড়া যেমন ভক্তের চলে না তেমনি ভক্ত ছাড়াও ভগবানের চলে না। মঙ্গলকাব্যের দেবতাদেরও ভক্তের দরকার কিন্তু তাহা শুধু আত্মপ্রচারের জন্যই। মঙ্গলকাব্যের দেবতা তাঁহার ভক্তকে ইন্দ্রলোকের ঐশ্বর্য দান করিয়া থাকেন, কিন্তু বৈষ্ণব—'ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে'। ধন, জন, বা সুন্দরী স্ত্রীর জন্য বৈষ্ণব ভগবানকে আরাধনা করেন না। বৈষ্ণবধর্ম নিষ্কাম আর শাক্তধর্মের ভক্তি সকাম।

> বৈষ্ণব ধর্মের শক্তি বলরূপিণী নয়—প্রেমরূপিণী। তাহাতে ভগবানের সহিত জগতের যে-দ্বৈতবিভাগ স্বীকার করে, তাহা প্রেমের বিভাগ—আনন্দের বিভাগ; তিনি বল ও ঐশ্বর্য বিস্তারের জন্য শক্তি প্রয়োগ করেন না—তাঁহার শক্তি সৃষ্টির মধ্যে নিজেতে নিজে আনন্দিত হইতেছে। এই বিভাগের মধ্যে তাঁহার নিয়ত মিলনরূপ প্রতিষ্ঠিত। শাক্তধর্মে অনুগ্রহের নিশ্চিত সম্বন্ধ। বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের নিশ্চিত সম্বন্ধ। শক্তির লীলায় কে পায়, কে না পায় তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মে প্রেমের বিকাশ যেখানে, সেখানে সকলেরই নিত্য দাবি। শাক্ত ধর্ম ভেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে—বৈষ্ণবধর্মে এই ভেদকে নিত্য মিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।—রবীন্দ্রনাথ।

কাজেই আদর্শের দিক হইতে বৈষ্ণবের ভক্তি শাক্তের ভক্তি হইতে উচ্চস্তরের। অন্ততঃ আদর্শের দিক দিয়া বিচার করিলেও বৈষ্ণব-কাব্য যে, মঙ্গলকাব্যকে পরাভূত করিয়াছিল ইহাতে কোন সংশয় নাই। ঐ যুগের বাঙ্গালী যে, শ্রদ্ধাসহকারে 'মঙ্গলচণ্ডী বিষহরির গীত' শুনিত তাহা শুধু ধর্মের জন্য নয়, মঙ্গলকাব্যগুলি তাহাদের প্রাণে আনন্দেরও সঞ্চার করিত। বৈষ্ণবকাব্য উদ্দেশ্যহীন আনন্দের যোগান দিয়া বাঙ্গালীর চিত্ত অধিকার করিয়া নিল।

বৈষ্ণব পদাবলীকে দুইটি সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত করা যায়—প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণবকাব্য এবং চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব কাব্য। চৈতন্যের পূর্ববর্তীকালের বৈষ্ণবকাব্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার যে-স্বরূপটি আমরা লক্ষ্য করি তাহাতে বৈষ্ণব ধর্মের মহান আদর্শ প্রায় অনুপস্থিত। কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগে ঐ আদর্শ ও তত্ত্বই কাব্যের আধারে বিধৃত হইয়াছে। ঐ যুগের কবিরা চৈতন্যদেবের স্বর্গীয়

অনুভূতি ও অধ্যাত্ম দর্শনের আলোকে চৈতন্যলীলাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। সুরধুনী তীর উজোর করিয়া যে 'অভিনব হেমকল্পতরু' তাঁহাদের প্রত্যক্ষ এবং মানসদৃষ্টির সম্মুখে ছিলেন তিনিই তাঁহাদিগকে দিব্যভাবে ভাবিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ সকল কবিগণের স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বের প্রকাশ করিবার কোন অধিকার ছিল না। বৈষ্ণব গোস্বামীরা অলঙ্কার ও মীমাংসা গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ লীলার যে-ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দিয়াছেন চৈতন্যোত্তর যুগের কবিগণের তাহা অতিক্রম করিবার কোন অধিকার ছিল না। ঐ সকল কবিদের প্রধান অবলম্বন ছিল রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বল নীলমণি' এবং 'ভক্তিরসামৃত' নামক গ্রন্থদ্বয়। বিশেষ করিয়া এই দুই গ্রন্থই তাঁহাদের কাব্যের ঘটনা-বিন্যাস ও ভাবধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই দুই গ্রন্থের এবং উদ্ধবসন্দেশ, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, গোবিন্দলীলামৃত, বিদগ্ধমাধব, জগন্নাথবল্লভ ইত্যাদি সংস্কৃতে রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যগ্রন্থের অনেক শ্লোককে বৈষ্ণব কবিরা বাঙ্গলা পদে পরিণত করিয়াছেন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে নায়ক-নায়িকার পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, বিরহ যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বৈষ্ণব কবিতার পদকর্তারা তাহা অন্ধের মত অনুসরণ করিয়াছেন। চৈতন্যোত্তর যুগই বৈষ্ণব সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। যে-সকল বৈষ্ণব কবিতাকে বিশ্ব-কাব্যসাহিত্যে আসন পাইবার যোগ্য বলিয়া মনে করা হয় তাহা এই যুগেই রচিত হইয়াছিল। প্রথাবদ্ধ সংস্কারের মধ্যে কবিমনকে আবদ্ধ রাখিয়া এই কবিতাগুলি রচিত হইয়াছিল, তথাপি ইহারা বিশ্বজনীন আবেদনে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কি এক অসাধারণ কবিত্বশক্তি থাকিলে ইহা সম্ভবপর তাহা সহজেই অনুমেয়।

॥ ২ ॥

জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি। জয়দেব সংস্কৃতে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন কিন্তু তিনি বাঙ্গলা পদকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছেন। 'জয়দেবই প্রথম কবি যিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাধা ও কৃষ্ণের নামে প্রচলিত লৌকিক প্রণয়-গাথাকে অলৌকিক জগতে পৌঁছাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই হিসাবে বাঙ্গলা পদাবলীর উপর জয়দেবের প্রভাব অনস্বীকার্য। জয়দেবের এমন অনেক পদ আছে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস যাহাদের আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের অভিনবত্বও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। তিনি জয়দেবের মতই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে পালাবদ্ধ সঙ্গীতের আকারে গ্রথিত করিয়াছেন এবং তাহাতে প্রথম দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের সংযোজন করিয়া তাঁহার মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। .তাঁহার কীর্তনের কাহিনী পুরাণাশ্রিত হইলেও পুরাণ-প্রচলিত কাহিনী হইতে অনেকাংশে পৃথক আর পরবর্তী যুগের পদাবলীর সঙ্গে তাহার [illegible] কোন মিলই নাই। বিদ্যাপতি ছিলেন রাজসভার কবি। তাঁহার প্রেমলীলা-বর্ণনায় অধ্যাত্ম তাৎপর্যের স্ফুরণ (প্রার্থনার পদগুলি বাদে) নিতান্তই আকস্মিক। তবে তিনিই প্রথম রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে মানবিক প্রেমকাহিনীরূপে কল্পনা করিয়া তাহাকে পরিণতির নানা স্তরে ভাগ করিলেন। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও রাধাকৃষ্ণের প্রেম মানবিক প্রেমের আধারে বিধৃত।

চৈতন্যোত্তর যুগের দার্শনিক তত্ত্ব ও ভক্তিবাদের নিয়মশৃঙ্খলা প্রাক্‌চৈতন্য যুগের পদাবলীতে অর্থাৎ জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসে প্রায় অনুপস্থিত। সাধারণ মানবিক প্রেমকাহিনীই তাঁহারা

রাধা ও কৃষ্ণ এই নায়িকা ও নায়কের মাধ্যমে চালাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টতই বাৎস্যায়নের কামসূত্র অনুযায়ী নায়ক-নায়িকার পরিকল্পনা করিয়াছেন। অন্যদিকে চৈতন্যোত্তর যুগের কবিরা বৈষ্ণব অলঙ্কার ও মীমাংসা গ্রন্থ দ্বারা তথা দার্শনিক তত্ত্ব ও ভক্তিবাদের নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্বারা শাসিত হইয়া নায়ক-নায়িকার প্রেমকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

জয়দেবের 'মধুরকোমলকান্ত পদাবলী'-র মাধুর্য অনস্বীকার্য কিন্তু ইহাতে যে পরিমাণে আদিরসের ভিয়ান দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ইহার মধ্যেও দার্শনিক তত্ত্ব ও ভক্তিবাদ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। অনেকে অনুমান করেন যে, জয়দেবের গীতগোবিন্দে শ্রীরাধার কৃষ্ণের কুঞ্জে যাত্রাই প্রথম অভিসারের সঙ্গীত। চৈতন্যোত্তর যুগের এমন কি বিদ্যাপতির অভিসারের পদাবলীতে যে-এক সুগভীর ব্যঞ্জনা পরিলক্ষিত হয় জয়দেব তাহার ধারে কাছেও যান নাই। কুঞ্জে রাধাকে একাকী পাইবার জন্য কৃষ্ণের অস্থিরতা এক কামুক নায়কের কথাই মনে করাইয়া দেয়। কামশাস্ত্রের অনুসরণে নর-নারীর বিহার ও বিপরীত বিহার বর্ণনা করা অনাধুনিক যুগের কবিদের একটি প্রিয় কবিকর্ম ছিল। জয়দেবের কাব্যেও তাহা রহিয়াছে এবং অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে তাহার অপূর্ব সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি পাঠ করিলে মনে হয় যেন জয়দেব গোস্বামী অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হইয়া বাঙ্গলায় নবগীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছেন।

জয়দেব তাঁহার প্রতিপালক প্রভু লক্ষ্মণসেনকে প্রীত করিবার জন্য তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। আর ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে আনন্দদানের জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। উভয় রাজসভার রুচিবোধ কবিদ্বয়ের কাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। জয়দেবের কাব্যে

রাধাকৃষ্ণের স্বর্গীয় (?) প্রেমলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে জগন্মাতা ও তাঁহার মানবসন্তানের স্নেহ-ভক্তি-বাৎসল্যের কথা স্থান পাইয়াছে। তবু কেন এই আদিরসের ছড়াছড়ি। আসল কথা ঐ যুগের রুচিবোধই এবম্প্রকার ছিল এবং কবিরা নলিচার আড়ালে তাম্রকূট সেবন করিয়াছেন। জয়দেবের কাব্যে অলৌকিকত্ব আরোপ করিয়া যাঁহারা তাঁহার উকিল সাজেন প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা জয়দেবের প্রতি অবিচার করেন। গীতগোবিন্দের মধুর শব্দ-ঝঙ্কার, সুললিত ছন্দ শুধু পরবর্তী বাঙ্গলা সাহিত্যকে নয় তাবৎ নবীন-ভারতীয় আর্য-ভাষার সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। জয়দেবের কৃতিত্ব সেইখানেই এবং সেইজন্যই জয়দেব চিরকাল অমর হইয়া থাকিবেন। তাঁহার কাব্যে বৈষ্ণব তত্ত্বের অন্বেষণ করা মূঢ়তা ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলার তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ও সংহত রূপ দিয়াছেন যাহা চৈতন্যোত্তর যুগে গভীর অর্থদ্যোতনা লইয়া দেখা দিয়াছিল।

জয়দেবের পরই বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কথা উল্লেখ করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট কুরুচিপূর্ণ কাব্য মাত্র। কিন্তু এই কাব্যে রাধাচরিত্রের ক্রমবিকাশ ও পরিণামে তাঁহার সর্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত আদর্শ প্রণয়িনীতে রূপান্তরিত হওয়া কবির অভূতপূর্ব নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। কৃষ্ণের বাঁশীর শব্দে ত্রিভুবন মোহিত। রাধা ঐ বাঁশীর শব্দ শুনিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। রাধার এই আকুলতা বড়ু যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।)

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিন্দী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥

বড়ুর কাব্যে আদিরসের একেবারে ছড়াছড়ি। তিনি গীতগোবিন্দ দ্বারা যে, প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার কাব্য পাঠ করিলেই বোঝা যায়। গীতগোবিন্দের বহু পদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বহু পদের আক্ষরিক সাদৃশ্য রহিয়াছে।

(প্রাক্-চৈতন্য যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি। চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণবতত্ত্ব তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল। আর বিদ্যাপতি ধর্মবিশ্বাসে ঠিক বৈষ্ণবও ছিলেন না। তিনিও রাজসভার কবি ছিলেন এবং রাজসভার রুচিকে তৃপ্ত করিবার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাধাকৃষ্ণ লীলার মানবিক আবেদন অনস্বীকার্য। তিনিই প্রথম রাধাকে ভাবমুগ্ধা কিশোরীরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যেও আদিরসের অসদ্ভাব নাই কিন্তু সেইগুলি বহুলাংশে স্থূলতাবর্জিত। 'তাঁহার কৃষ্ণ কখনও ভগবান, কখনও বা প্রাকৃত দেহসৌন্দর্যপিয়াসী নায়ক; তাঁহার রাধা কখনও আদর্শ-ভক্ত, কখনও বা প্রণয়তত্ত্বে অভিজ্ঞা সুচতুরা নায়িকা, যিনি নায়ককে গোঁয়ার বলিয়া ব্যঙ্গ করেন। তাঁহার ভণিতায় ঠিক ভক্তের তন্ময়তা ফোটে নাই, রাজানুগৃহীতের কৃতজ্ঞতা ও স্তুতি শোনা যায়।' তৎসত্ত্বেও বৈষ্ণব কবিতার যে-শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া আমরা গর্ব করি তাহার অনেকটা কৃতিত্ব বিদ্যাপতির প্রাপ্য।

বিদ্যাপতি বয়ঃ-সন্ধি, রূপ-বর্ণনা, আক্ষেপানুরাগ, ভাব-সম্মিলন, প্রার্থনা, রূপানুরাগ ও অভিসার সম্পর্কে যে-সব পদ রচনা করিয়াছেন তাহাদের কাব্যসৌন্দর্য তুলনারহিত।

তাঁহার বয়ঃ-সন্ধির—

কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
চলইতে সহচরী কর অবলম্ব ॥

রূপানুরাগের—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥

পূর্বরাগের—

নহাই উঠল তীরে রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বর কান।
গুরুজন সঞে লাজে ধনি নতমুখী
কৈছনে হেরব নয়ান॥

অভিসারের—

পুরুষক বেশে কয়ল অভিসার।

বিরহের—

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
ই ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥

ভাব-সম্মিলনের—

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥

প্রার্থনার—

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥

অথবা

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব্ মঝু হব কোন কাজে ॥

পদগুলি বিশ্বের কাব্যক্ষেত্রে সূর্য-করোজ্জ্বল শিশিরবিন্দুর ন্যায় চিরকাল ভাস্বর থাকিবে।

বিদ্যাপতির কাব্যে আদিরসের প্রাচুর্যের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। ইহা মূলতঃ বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান রস। বৈষ্ণব পদাবলীর স্থায়ীভাব রতি এবং স্থায়ী রস শৃঙ্গার। 'বৈষ্ণব ধর্মের মধুর রসে প্রাকৃত শৃঙ্গার রসের দিব্য পরিণতি; লৌকিক প্রেমকে উপাদানরূপে ব্যবহার করিয়া ভগবৎ-সাধনার ভক্তিপ্লুত, আত্মবিলোপী আবেগটি স্ফুরিত হইয়াছে। সুতরাং বৈষ্ণব ধর্মে এই উভয় উপাদানের একটি সহজ সামঞ্জস্য আছে।'

বৈষ্ণব মতে মধুর রসের ভজনাই শ্রেষ্ঠ সাধন পদ্ধতি। আর এই মধুর রসের প্রস্রবণ প্রবাহিত হইয়াছে রাধাকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ—সম্ভোগাত্মক শৃঙ্গার বর্ণনায়। ইহার মধ্যে নিঃসন্দেহে দার্শনিক তত্ত্ব আছে এবং যেহেতু বৈষ্ণব পদকর্তারা সকলেই মহাজন ছিলেন সেইজন্য এই তত্ত্বকেই তাঁহারা কাব্যে রূপ দিয়াছেন। কিন্তু সন্দেহ হয় যে, এই মিলন-বিরহ বর্ণনা কি শুধুই তত্ত্বের কাব্য-রূপায়ণ? মানবিক প্রেমকে, সাধারণ মানুষের দেহগত কামনা বাসনা কি ঐ সকল মহাজনদের মনকে একেবারেই স্পর্শ করে নাই? তাহাই যদি হইবে তবে এত আদিরসের ছড়াছড়ি কেন? মানবিক প্রেমের এত বাস্তব বর্ণনা তাঁহারা কোথায় পাইলেন?

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।
বিজন বসন্তরাতে মিলন-শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দু'টি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিলে মগ্ন করি। এত প্রেমকথা,
রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে।—

এই সুতীব্র মানবিক আবেদনই আমাদের কাছে বৈষ্ণব কবিতাকে এত প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু একশ্রেণীর ভক্তের মতে যেহেতু বৈষ্ণব কবিতায় সেই পরমপুরুষের প্রেমলীলা বর্ণিত হইয়াছে সেই হেতু ইহার মধ্যে কামনা বাসনার কথা কিছু নাই। ঐ সকল কবিতা পাঠ করিয়া যাহাদের মনে কামনা জাগ্রত হইবে তাহারা যেন বৈষ্ণব কবিতা পাঠ না করে ইহাই হইল ঐ সকল ভক্তের উপদেশ। ইহা হইল অভিমানের কথা। জয়দেব গোস্বামী তাঁহার কাব্যের উপসংহারে আশা প্রকাশ করিয়াছেন।

সাধ্বী মাধ্বীক চিন্তা ন ভবতি ভবতঃ শর্করে কর্করাসি
দ্রাক্ষে দ্রক্ষ্যন্তি কে ত্বামমৃত মৃতমসি ক্ষীর নীরং রসস্তে।
মাকন্দ ক্রন্দ কান্তাধর ধরণিতলং গচ্ছ যচ্ছন্তি যাব-
দ্ভাবং শৃঙ্গারসারস্বতমিহ জয়দেবস্য বিষ্বগ্বচাংসি॥

অর্থাৎ—জয়দেবের এই শৃঙ্গার রসাত্মক কাব্য যতদিন বর্তমান থাকিবে ততদিন মধু-র চিন্তা কেহ করিবে না, শর্করা কর্করত্ব প্রাপ্ত হইল, দ্রাক্ষাকে কেহ দেখিবে না, অমৃত মৃত হইল, ক্ষীরের স্বাদ নীরের মত হইয়া গেল, আম্র ক্রন্দন করিবে এবং কান্তাধরকে রসাতলে যাইতে হইবে।

কাজেই তথাকথিত ভক্তদলের উপদেশ কেহ গ্রহণ করিবে বলিয়া মনে হয় না। আসল কথা তত্ত্বগত দিক যাহাই থাকুক না কেন বৈষ্ণব পদাবলীর মানবিক আবেদন অফুরন্ত এবং তাহাতে অন্যায় কিছু হয় নাই বরং এইখানেই এই সাহিত্যের মহনীয়তা। আর বৈষ্ণব ধর্ম প্রেমধর্ম। তাই—

> আমরা যাহাকে ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য-সম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত আছে। বৈষ্ণব ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয় মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে—তখন এই সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে। —রবীন্দ্রনাথ

এই ভালবাসার চিত্র, প্রিয়-পরিজন স্নেহ-প্রেম-বাৎসল্যের কাহিনী বৈষ্ণব কবিতার প্রাণ। তাই একদিকে যেমন ঐ কবিতায় ভোগ-বাসনা-কামনার কথা আছে অন্যদিকে আছে ত্যাগ, তিতিক্ষা, দুঃখবরণ ও আত্মবিসর্জন। এবং এই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে বৈষ্ণব কবিতার রসহানির কোন সম্ভাবনা দেখি না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত সাহিত্যের কবিদের মতই বৈষ্ণব কবিরা প্রেম ও কামে কোন পার্থক্য করিতেন না। কারণ তাঁহাদের মতে—

> What is natural cannot be vicious, what every one knows, surely everyone may express; and that mind which is only safe in ignorance, or which is only defended by decorum, possesses but a very feeble defence and impotant sincerity. —Wilson.

তদুপরি বৈষ্ণবগণ প্রেম ও কৃষ্ণকে তত্ত্বগত দৃষ্টিতে এক ও অবিভাজ্য-রূপে দেখিয়াছিলেন। আর বৈষ্ণব পদাবলীর যে-একটি সামগ্রিক আবেদন আছে যাহা পরিণামে মনকে অলৌকিক রসের জগতে পৌঁছাইয়া দেয়, সেই সামগ্রিক রূপের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের কামলীলা মানাইয়া গিয়াছে।

> বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে এমন অংশ আছে, যাহা নির্মল নহে কিন্তু সমগ্রের মধ্যে শোভা পাইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব কাব্যের প্রেমের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে রাধার খণ্ডিতা অবস্থার বর্ণনা আছে। আধ্যাত্মিক অর্থে ইহার কোন বিশেষ গৌরব থাকিতে পারে কিন্তু সাহিত্য হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের এই কামুক ছলনার দ্বারা কৃষ্ণ-রাধার প্রেমকাব্যের সৌন্দর্যও খণ্ডিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাধিকার এই অবমাননায় কাব্যশ্রী অবমানিত

হইয়াছে। কিন্তু প্রচুর সৌন্দর্যরাশির মধ্যে এ সকল বিকৃতি আমরা চোখ মেলিয়া দেখি না। সমগ্রের প্রভাবে তাহার দূষনীয়তা অনেকটা দূর হইয়া যায়। লৌকিক অর্থে ধরিতে গেলে বৈষ্ণব কাব্যে প্রেমের আদর্শ অনেক স্থলে স্খলিত হইয়াছে। তথাপি সমগ্র পাঠের পর যাহার মনে একটা সুন্দর ও উন্নত ভাবের সৃষ্টি না হয় সে হয় সমস্তটা ভাল করিয়া পড়ে নাই, নয় কাব্যরসের রসিক নয়। —রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীচৈতন্যদেবের আর্বিভাবের পর বৈষ্ণবপদাবলীর গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইল। মহাপ্রভু 'অন্তরঙ্গ সনে' যে-লীলারস আস্বাদন করিতেন এবং যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূলতত্ত্ব, ঐ সময়ে এবং তৎপরবর্তীকালে রচিত বৈষ্ণব পদাবলী তাহাকেই রূপ দিয়াছে।* 'শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে রাধার বিরহব্যথা জীবন্তভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার উজ্জ্বল দেহকান্তি শ্রীরাধিকার অনুরূপ ছিল। তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমও শ্রীরাধার তন্ময়তা স্মরণ করাইয়া দিত। এই রাধাভাবদ্যুতি—সুবলিত নবীন সন্ন্যাসী প্রেমের বন্যায় সারা বঙ্গদেশ ভাসাইয়াছিলেন। সেই প্রেমসিন্ধু হইতেই পদাবলীরূপ কৌস্তুভমণির উদ্ভব।'

অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিই তখন চৈতন্যদেবের শিষ্য-প্রশিষ্য দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ফলে ঐ সকল পদকর্তারা নিজেদের ব্রজলীলার অঙ্গীভূত মনে করিতেন। ইঁহারা গোষ্ঠলীলার পদাবলীতে নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের সখা এবং মধুর রসের পদাবলীতে সখী স্থানীয় মনে করিতেন। চৈতন্যোত্তর যুগের কবিদের পদ লইয়া আলোচনা করিলে মনে হইবে যেন ঐ সকল কবিরা একপ্রাণ একমন ছিলেন। পদের নীচে পদকর্তার নাম না থাকিলে কোন্ পদটি কাহার রচনা তাহা সহজে ধরিবার উপায় নাই। তাঁহারা যেন একই রসগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

* পরবর্তী অধ্যায়ে ঐ তত্ত্বের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

ভাবও প্রত্যেকেরই এক। এক কবির পদে যে-ভাব পাওয়া যায় অন্য কবির পদে ঠিক সেই ভাবই পাওয়া যাইবে। আসল কথা হইল এই যে, প্রেমের বন্যায় নিজেদের ভাসাইয়া দেওয়াই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য বস্তু ছিল। কাজেই এক ভাব এবং একই ভাষার মধ্যে তাঁহারা আত্মবিলোপ করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলী যথার্থ ই গোষ্ঠী-সাহিত্য।

কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, প্রথাবদ্ধ সংস্কারের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখিয়াও ইঁহারা অপূর্ব কবিকৃতি দেখাইয়াছেন। বৈষ্ণব অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রের নির্দেশ কিছুমাত্র লঙ্ঘন না করিয়াও তাঁহারা তাঁহাদের কাব্যে এক অনির্বচনীয় আস্বাদন সৃষ্টি করিয়াছেন।

সাধন-ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তারে প্রেম নাম কয়॥
প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে স্নেহ মান ও প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥

বলাই বাহুল্য এই মহাভাবকে ভাষার বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় না। ইহা অনির্বচনীয়। এই অনির্বচনীয়ের আবেদন চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীতে সম্পূর্ণরূপেই উপস্থিত। এই যুগের পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিঃসন্দেহে লৌকিক প্রেমের বন্ধনকে অস্বীকার করিয়া অলৌকিক জগতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। মানবিক প্রেমের অনুসরণেও যদি এই প্রেমলীলা বর্ণিত হইয়া থাকে তথাপি ইহার সুগভীর আর্তি লোকাতীত।

চণ্ডীদাসের—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥

এই যে, নাম শ্রবণ মাত্রই অঙ্গ অবশ হইয়া যাওয়া ইহা কি লৌকিক প্রেমে সম্ভব?

অথবা,

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ান তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমত যোগিনী পারা॥

অথবা,

গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছলছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥

অথবা,

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি॥
দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

অথবা,

অকথন বেয়াধি কহন নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥

পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলী যেন ভূমেতে লোটায়॥

এই সুগভীর আর্তি মানবিক প্রেমে সুদুর্লভ।

জ্ঞানদাসের—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

কিংবা,

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল

এই যে, রূপানুরাগ তাহাকে সাধারণ দৈহিক মিলনের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কোন মতেই সমপর্যায়ভুক্ত করিতে পারা যায় না।

অথবা গোবিন্দদাসের রাধা যখন—

কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥

অভিসারের জন্য শ্রীরাধা যখন এই দুরূহ কৃচ্ছ্রসাধন করেন তখন প্রাকৃত প্রেমের কথা মনে জাগিয়া উঠে না। তখন মনে জাগিয়া উঠে সেই অরূপ ও অসীমের অনুভূতি। বৈষ্ণব কবিরা প্রাকৃত জগৎকেই আশ্রয় করিয়া সেই অপ্রাকৃতের ছবি আঁকিয়াছেন। নরদেহের কামনা

বাসনাকে তাঁহারা অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু দেহসর্বস্বতার মধ্যেই তাঁহাদের কবিতার আবেদন শেষ হইয়া যায় নাই। মর্তের পথ ধরিয়াই তাঁহারা স্বর্গের পথে যাত্রা করিয়াছেন।

'বৈষ্ণব কবিতা সমুদ্রগামী নদীর ন্যায়। নদী চলিয়াছে; দুই দিকে তটভূমি, তাহা আনন্দ-কলরবে মুখরিত হইয়া নদী চলিতেছে; দুই ধারে ফল-ফুল-সমন্বিত তরুলতা, জন-কোলাহল, পল্লীর অপূর্ব সৌন্দর্য, ফুলের বাগান। কিন্তু যখন নদী মোহনায় আসিল, তখন সে-সমস্ত দৃশ্য সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে, আর সে বিহগ-কূজিত, জন-কোলাহল-মুখরিত, উদ্যান-সঙ্কুল বনভূমি—এ সকলের কিছু নাই—সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মত অসীমের প্রতীক মহাসমুদ্র। বৈষ্ণব কবিতা নানারূপ পার্থিব সৌন্দর্যের পথ বাহিয়া চলিয়াছে—কিন্তু তাহার পরম লক্ষ্য সেই অজ্ঞেয় দুরধিগম্য মহাসত্য।'

—দীনেশচন্দ্র সেন।

বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে আরও একটি বক্তব্য আছে। শুধু পাঠ করিয়া এই কবিতার রসাস্বাদন সম্ভব নহে। গায়ক যখন সুর ও তাল সহযোগে এই কবিতা গান করেন তখনই ইহার পরিপূর্ণ রসটি উপলব্ধ বা আস্বাদিত হইতে পারে। সেই হেতু কবিতা হিসাবে বৈষ্ণব কবিতা অর্ধসৃষ্টি, সুর সহযোগে ইহার পূর্ণত্বপ্রাপ্তি। সেইদিক দিয়া বিবেচনা করিলে বৈষ্ণব কবিতাকে খাঁটি লিরিক বা গীতি-কবিতা বলা যায় না।

গীতি-কবিতার অর্থ গান ও কবিতার সংমিশ্রণ। ইংরাজী সাহিত্যে গীতি কবিতাকে বলা হয় Lyric. সঙ্গীতমূলক এই কবিতাগুলি বীণা-যন্ত্রের (Lyre) সহযোগে গীত হইত বলিয়াই ইহাদের নাম হইয়াছে Lyric বা গীতি-কবিতা। কিন্তু আধুনিক কাব্যে গীতি-কবিতার যে-রূপটি দেখা যায় তাহাতে তাহাকে সঙ্গীতের সঙ্গে এক সারিতে বসাইলে

ভুল করা হইবে। ইহাদের মধ্যে গীত ও কবিতার অর্থাৎ সঙ্গীত ও গীতি-কবিতার পার্থক্যটি বিশেষ সুপরিস্ফুট। আধুনিক গীতি-কবিতার মধ্যে সঙ্গীতধর্মিতা থাকিলেও ইহা নিছক সঙ্গীত নহে। কারণ শব্দচয়ন ব্যাপারে সঙ্গীত-রচয়িতার হাত পা বাঁধা। সুরের প্রয়োজনে তাঁহাকে শব্দ নির্বাচন করিতে হয়। যে-সকল শব্দ সুরাত্মক এবং অতি সহজে উচ্চার্য, সঙ্গীত রচয়িতা সেইগুলিকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া সঙ্গীতে ভাবের বৈচিত্র্য থাকে না। একটি সঙ্গীতে একাধিক ভাবকল্পনা অসম্ভব। অপর দিকে গীতি-কবিতায় ভাবের বৈচিত্র্য থাকায় কোন বাধা নাই এবং তাহাতে শব্দচয়ন ব্যাপারে কবির পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার অর্ধেক প্রাণ তাহার সুরে নিবদ্ধ। তদুপরি প্রথাবদ্ধ সংস্কারে কবিমন আবদ্ধ থাকায় কবির চিত্তবৃত্তির স্বাধীন প্রকাশ সব সময় সম্ভব হয় নাই। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতা আমাদের মনে যে-অনির্বচনীয় আস্বাদ ও ভাবাবেগের সৃষ্টি করে সেই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ইহা পৃথিবীর যে-কোন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতার সঙ্গে সমকক্ষতার স্পর্ধা দাবী করিতে পারে।

বৈষ্ণব মতবাদের ঐতিহাসিক উৎস: ধর্মনীতিক ও দার্শনিক ভিত্তি

ভারতে প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে বাঙ্গলায় আচরিত বৈষ্ণব ধর্মের একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ধর্মের দিক দিয়া বাঙ্গলায় বৈষ্ণব ধর্মকে একটি মিশ্র ধর্ম বলা যাইতে পারে। কারণ ভারতে প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মে চৈতন্যদেব কর্তৃক আনীত নূতন ভাবধারা যুক্ত হইয়া এই ধর্মকে এক অপূর্ব বিশিষ্টতা প্রদান করিয়াছে এবং তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব

দর্শনের ভিত্তি। এই দর্শনকে বুঝিতে হইলে চৈতন্যদেবের পূর্বে ভারতে প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মের ধারাটি অনুধাবন করা প্রয়োজন।

বিষ্ণুর ভক্ত এই অর্থে বৈষ্ণব কথাটি ব্যবহৃত হয়। বৈষ্ণব ধর্ম বেদ-মূলক বলা যাইতে পারে। জ্ঞান ও কর্ম মার্গ হইতে ভক্তিকে পৃথক করিয়া দেখা ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বিষ্ণু উপাসনার মধ্য দিয়াই এই ভক্তিবাদ প্রসার লাভ করে। বিষ্ণুর উপাসনা বিষয়ে প্রাচীন প্রমাণ ঋগ্‌বেদ সংহিতা। ঐ সংহিতার মধ্যে অনেকগুলি বিষ্ণুসূক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 'পরদুঃখ প্রহাণেচ্ছা এবং নিজে সকলের দুঃখ বহনেচ্ছা ইহাই হইল প্রকৃত বৈষ্ণবতা।' বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনিই ভগবান। অর্থাৎ বিষ্ণুভাবে তিনি যেমন ভগবান্ কৃষ্ণভাবেও তিনি ভগবান—এক ভগবানেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপকল্পনা।

এই ভগবান বা কৃষ্ণের স্বরূপ কি? সেই পরম পুরুষ রস-স্বরূপ—রসো বৈ সঃ......। জীব ও জগৎকে তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের অন্তরালে আনন্দময় সত্তারূপে বিরাজ করিতেছেন। এই আনন্দময় সত্তাই রস-স্বরূপ। এই রস-স্বরূপকে লাভ করিলেই জীবন আনন্দময় হইবে। রস হইতেছে আনন্দের নির্যাস। সেই নির্যাসকে হৃদয়ের স্নেহপ্রীতি দিয়া আস্বাদন করিতে হইবে। হৃদয়ের অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। এই রসের অস্তিত্ব কোথায়? না—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতি সকল ব্যাপারের পশ্চাতে সেই তেজোময়, অমৃতময়, মধুময় পুরুষ সেই মধুপ্রাণ বিরাজমান। তিনি আছেন বলিয়াই জগৎ আনন্দময়। এই রসস্বরূপ পুরুষ প্রেমময়, আনন্দময়, মধুময়। তিনি আত্মার প্রিয়। তিনি প্রিয়তম। তিনিই ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান এবং বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তিবাদীরা নিজের আত্মার অস্তিত্বে যেমন বিশ্বাসী তেমনি আনন্দময় জগতের পশ্চাতে

ঐ পরমাত্মার অস্থিত্বেও তেমনই বিশ্বাসী। আমাদের চিত্তে রসস্বরূপ একটি বৃত্তি আছে। এই বৃত্তি হইতেই ভক্তির জন্ম। জ্ঞানকাণ্ড এই বৃত্তির অধীন নহে।

প্রাচীন ভারতীয় পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। কখনও তিনি ব্রজরাখাল—ব্রজের গোপবালকগণের সঙ্গে গোচারণে রত, কখনও তিনি গোপীজনবল্লভ, কখনও অত্যাচারী কংসনিধনে রত। কখনও বা তিনি কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে কূটনীতিবিদরূপে প্রতিভাত। বৈষ্ণবেরা লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার রসেই নিজেদের চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তাহাতে বিশেষ তাৎপর্য আরোপ করিয়াছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, শুধুমাত্র ভক্তি ও বিশ্বাসকে সম্বল করিয়া ঈশ্বরোপাসনা ভারতে সুপ্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এই ভক্তিবাদীদের মানস কল্পনা হইতেই শ্রীকৃষ্ণের উদ্ভব। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ভক্তিধর্মের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ। এই গ্রন্থে জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গের উপর ভক্তিকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন—'যোগী তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্মীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যে যোগী সমস্ত হৃদয়-মন আমাতে সমর্পণপূর্বক আমাকে শ্রদ্ধাপূর্বক ভজনা করে তিনি যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভক্তিপরায়ণ হইয়া মদ্‌গতচিত্ত লইলে আমাকে তুমি প্রাপ্ত হইবে। সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমাতে শরণ লইলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব।' এই শরণাগতিই ভক্তিযোগের চরম লক্ষ্য।

রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বৈষ্ণবদের একমাত্র আরাধ্য বস্তু। রাধা কোথা হইতে আসিলেন? বৈষ্ণবমতে রাধা কৃষ্ণের শক্তি, যেমন লক্ষ্মী বিষ্ণুর শক্তি অথবা পার্বতী শিবের শক্তি। সর্বশক্তিমান ভগবানের

'শক্তি' কল্পনা ভারতীয় ধর্মের একটি অবদান। সর্বশক্তিমান যাহা কিছু করিতেছেন তাহার মূলে রহিয়াছে তাঁহারই এক সর্বব্যাপিনী শক্তি। এই শক্তিই সর্ব ক্রিয়া এবং সর্ব জ্ঞানের মূল কারণ। এই শক্তিই দেবী, তিনি মহামায়া। মূলতঃ কিন্তু শক্তিমান ও শক্তি অভেদ। এই অভেদত্ব ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত হইলেও শক্তিকে শক্তিমান হইতে পৃথক করিয়া তাঁহার মহিমা কীর্তন ভারতীয় শক্তিবাদের মূলতত্ত্ব। এই শক্তিবাদই ভগবানকে মাতৃরূপে আরাধনা করিবার প্রেরণা দিয়াছে।

ভারতবর্ষের এই শক্তিবাদ বৈদিক কিনা তাহা লইয়া বিতর্ক রহিয়াছে। অনেকের অনুমান এই যে, মাতৃতান্ত্রিক অনার্যসমাজ হইতে আর্যসমাজে শক্তিবাদের পরিকল্পনাটি আসিয়াছে। বেদে স্ত্রী-দেবতাদের স্থান অত্যন্ত নগণ্য ; উহাতে পুরুষ দেবতাদের প্রাধান্য অবিসংবাদিত-রূপে স্বীকৃত। কাজেই বৈদিক আর্যসমাজে ভগবানের 'শক্তি' কল্পনা অনার্য প্রভাবের ফল এবং আর্য-অনার্যের মিশ্রণের ভিত্তিতেই হিন্দুধর্মের উদ্ভব হইয়াছে। শক্তি পূজার প্রধান ধারক শাক্ত বা শৈব সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা হইলেও ইহার প্রভাব বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের উপরই পরিলক্ষিত হয়। শাক্তরা যে-সৃষ্টিতত্ত্বের পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে আদিদেবে পিতৃত্ব এবং আদিদেবীতে মাতৃত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই আদিদেব ও আদিদেবী শিব ও পার্বতীতে রূপান্তরিত হইয়াছেন। ভারতীয় কল্পনায় বহু পুরুষ দেবতা এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেরই শক্তি হিসাবে এক একজন স্ত্রীদেবতার পরিকল্পনা করা হইয়াছে—যেমন, বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী, তিনি যখন রাম তখন তাঁহার শক্তি সীতা, আবার তিনিই যখন কৃষ্ণ তখন তাঁহার শক্তি রাধা। কিন্তু সকল দেবতা এবং তাঁহাদের শক্তিবৃন্দ পরিণামে সেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মে লয় পাইয়াছেন। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়—ইহাই ভারতীয় দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত।

পুরুষ দেবতার শক্তিকে আলাদা করিয়া তাঁহাকে পূজা করা এবং তাঁহার মহিমা কীর্তনের বিশিষ্ট রীতি হিন্দুধর্মে রহিয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণের শক্তি রাধাকে পৃথক করা যায় না। কারণ বৈষ্ণব দর্শনে কৃষ্ণ ও রাধা অভিন্ন—তাঁহাদের যুগল মূর্তির আরাধনাই বৈষ্ণবের কাম্য।

রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রের প্রমাণ॥

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রচিত ভাগবত ভক্তিবাদীদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের ইহাই প্রধান শাস্ত্র। এই ভাগবত রচিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন পুরাণ—স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, অগ্নিপুরাণ ইত্যাদিতে বৈষ্ণব ধর্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর পর যে-ভাবে রাধাতত্ত্বটি রূপ পাইতে লাগিল এই শতাব্দীর পূর্বে তাহার প্রচলন কতটা ছিল তাহা জোর করিয়া বলা শক্ত। কারণ এই শতাব্দীর পূর্বে 'রাধা' নামের উল্লেখ খুব কম গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের গোপীলীলার কাহিনীটি তখনও দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। তবে এই গোপীলীলার কাহিনীর সঙ্গে একজন বিশেষ গোপীর সঙ্গে কৃষ্ণের লীলার কথার উল্লেখ ইতস্ততঃ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবতেও রাধার নামের উল্লেখ নাই। ইহাতেও রাসলীলা বর্ণনায় কৃষ্ণের বিশেষ একজন গোপীর প্রতি প্রীতির কথাই বলা হইয়াছে।

অষ্টম শতাব্দীতে রচিত ভাগবত ভক্তিবাদীদের আকর গ্রন্থ একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই শতাব্দীতেই শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব। আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ উপনিষদের সারাংশ ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠিত। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ এবং এই সম্পর্কে বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের মতবাদ সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

শঙ্কর—শঙ্করের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—জগৎ মিথ্যা। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ব্রহ্ম প্রতিভাত হইয়াছেন জীবরূপে। তিনি পরিণামে জীব হন না। যাঁহারা বলেন ব্রহ্ম পরিণামে জীব ও জগৎ হন তাঁহারা পরিণামবাদী। ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ। যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্তা সেই ভগবান বা সবিশেষ ব্রহ্ম তিনিও মায়াকল্পিত। ইহাদের সত্যকার অস্তিত্ব নাই। অতএব ইহারা মিথ্যা; সত্য একমাত্র ব্রহ্ম এবং জীবও আসলে ব্রহ্মই। জীব, জগৎ ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। ইন্দ্রিয় দ্বারা (দেখা, শোনা, বলা, স্পর্শ করা ইত্যাদি) আমরা এই জগৎকে উপলব্ধি করি। এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলি রুদ্ধ করিয়া দিলে জগতের অস্তিত্ব থাকিবে না, থাকিবে শুধু সদাজাগ্রত এক চৈতন্য। এই চৈতন্যই ব্রহ্ম। তবে ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া কেন যে, জীব ও জগৎ হইল তাহা বলা যায় না। ইহার কারণটি অনির্বচনীয়। জীব জগৎ প্রভৃতি এই অনির্বচনীয় মায়ার (মায়া কেন হইল তাহাও বলা যায় না) বলেই প্রতিভাত। সত্যকার ইহাদের অস্তিত্ব নাই—ইহারা উপাধি মাত্র। এই জগতের অস্তিত্ব-সত্য হইল প্রাতিভাসিক সত্য—ইহাদের কোন পারমার্থিক সত্য নাই। অতএব ইহা মিথ্যা। সত্য এক ব্রহ্ম।

রামানুজ—ইহার আবির্ভাব কাল একাদশ শতাব্দী। তাঁহার মতে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় বটেন কিন্তু নির্গুণ নহেন। তিনি সকল কল্যাণ গুণের আধার। জীব ও জড়, চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মেরই দেহ। সুতরাং জীব-জগৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্মই সত্য। মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি। ব্রহ্ম লীলার জন্য মায়া অবলম্বন করেন। এই মতবাদকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলে। এই মতে ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', কেন না ব্রহ্মের অতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র সত্তা জীব বা জগতের নাই। শঙ্করের ব্রহ্ম উপাসনার বিষয় নহেন। তাঁহার মতে ভক্তিও অজ্ঞানতা প্রসূত, তবে ইহা চিত্তশুদ্ধির

উপায় বলিয়া অবস্থা বিশেষে আশ্রয়ণীয়। রামানুজের মতে ব্রহ্ম উপাসনা বা আরাধনার বস্তু। আর ভগবানের অর্থাৎ ব্রহ্মের উপাসনা করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। রামানুজের মতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভগবানের গুণাবলীর স্মরণের নামই ভক্তি।

রামানুজ বলিলেন যে, মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি। বৈষ্ণব মতে এই মায়া বড় হইয়া দাঁড়াইলেন। যে শক্তি দ্বারা ব্রহ্ম নিজেকে বহুধা বিভক্ত করিয়া নিজের স্বরূপ আস্বাদন করেন তাহাকেই বৈষ্ণবেরা মায়া বলেন।

মধ্বাচার্য—দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। ইনি দ্বৈত মতের প্রতিষ্ঠা করেন। শঙ্কর যেমন পূর্ণ অদ্বৈতবাদী ইনি তেমনি পূর্ণ দ্বৈতবাদী। ইনি বলেন, ব্রহ্ম ও জীব সম্পূর্ণ পৃথক। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণকে সদ্ বৈষ্ণব বলা হয়। ইঁহাদের মতে জীব ব্রহ্মের দাস।

নিম্বার্ক—পঞ্চদশ শতাব্দী। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার মতে শক্তি ও শক্তিমান যেমন পৃথক অথচ এক, ব্রহ্ম ও জীবও তেমনই ভিন্ন অথচ অভিন্ন। সমুদ্রে যেমন মাছ থাকে, জীবের তেমনই ব্রহ্মে অবস্থিতি। কিন্তু মাছে যেমন সমুদ্র থাকে না তেমনি জীবে ব্রহ্ম থাকেন না। চিৎ-অচিৎ যাহা কিছু এই ব্রহ্ম সমুদ্রে উৎপন্ন ও বিলীন হয়। যেমন,—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা ॥

বল্লভাচার্য—নিম্বার্কের সমসাময়িক। শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার মতে জীব মাত্রেই ব্রহ্মের অংশ। বহ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় তেমনি ব্রহ্মরূপ বহ্নি হইতে জীবরূপ স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়াছে। সেই অক্ষয় পুরুষ বিভু (সর্বব্যাপী) কিন্তু জীব অণু। জীব

যখন শুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যখন তাহার মধ্যে আনন্দাংশের প্রকাশ ঘটে তখন সেও ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া যায়। স্বরূপত জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। ভক্তিই শুদ্ধত্ব প্রাপ্তির উপায়। গোলোকধামে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কথা তিনি স্বীকার করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বা অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব—শঙ্কর হইতে বল্লভাচার্য পর্যন্ত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকাররা অদ্বৈতবাদী ও ভক্তিবাদী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মহাপ্রভু শঙ্করের মত খণ্ডন করেন এবং ভক্তিবাদীদের ভাষ্যকে উন্নত করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। চৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায় যে, মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ ও সার্বভৌমের সহিত বিচার করিয়া এই মতের প্রতিষ্ঠা করেন। অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বটি হইতেছে মোটামুটি এই—'জগৎ ও জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে আবার অভিন্নও নহে। জগৎ ও জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের যে সম্বন্ধ তাহাতে অভেদের মধ্যে ভেদ এবং ভেদের মধ্যে অভেদের নিত্য প্রতিষ্ঠা হইতেছে। যেমন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্পর্ক।' জানিবার বস্তু যতক্ষণ যিনি জানিতে চাহেন তাহার সঙ্গে এক না হয় ততক্ষণ পূর্ণ জ্ঞান হয় না। আবার ভিন্ন না হইলেও জ্ঞান সম্ভব নয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ভেদাভেদ সম্পর্ক বিদ্যমান আছে। তেমনই ভোক্তা ও ভোগ্যের সম্পর্ক।

জীব ও জগৎ ব্রহ্ম নহে আবার ব্রহ্মের বাহিরেও নহে। ব্রহ্ম জীব ও জগতের স্রষ্টা ও নিত্য আশ্রয় হইয়াও জগৎ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া আছেন। এই জগৎ ও জীব ঈশ্বরের জ্ঞানের ও ভোগের বিষয় হইয়া অনাদিকাল তাঁহারই মধ্যে রহিয়াছে। অনন্ত ব্রহ্মের সকল প্রকাশ, সকল রূপ ও রসের বিচিত্র মূর্তিকে অলীক ও মায়িক বলিতে সৃষ্টির আদিতে অব্যক্ত অবস্থায় চলিয়া যাইতে হয়। অব্যক্ত যখনই আপনাকে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, অনন্ত যখন আপনাকে নানা রূপরসে নানা

বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশ করিতে লাগিলেন, সেই প্রকাশের সেই ব্যক্তের জগতেই জ্ঞানের ও আনন্দের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। সৃষ্টির আদিতে যাহা, সেই অসীম, অনন্ত, মহাশূন্য ব্যোমের কথা শুধু তত্ত্ব মাত্র। তাহার সহিত আমাদের জীবনের কোন যোগ নাই। এই তত্ত্ব অব্যক্ত ও অনন্ত। এই অব্যক্ত ও অনন্তই জীব ও জগতের নানাবিধ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। ইনি আনন্দস্বরূপ কাজেই ইঁহার সৃষ্টির সব কিছুই আনন্দময়। এই ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানবস্তু; ইহাই বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ আর তাঁহার সৃষ্ট জীব ও জগৎ তাঁহার প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। তিনি একা ভোক্তা আর জীব ও জগৎ অনুক্ষণ তাঁহার নিত্য লীলার আয়োজন রচনা করিতেছে। এই জন্যই বিশ্বের একমাত্র পুরুষ তিনি।

এই জীব ও জগৎ অর্থাৎ প্রকৃতি পরমপুরুষের (ভগবানের বা শ্রীকৃষ্ণের) জ্ঞানের ও পূর্ণানন্দের আশ্রয়। এই প্রকৃতি নিত্যকাল পুরুষের অনুসরণ করিতেছে আর পুরুষ তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। ব্যক্ত ও অব্যক্তের নিত্যলীলাই পুরুষ-প্রকৃতির লীলা। অব্যক্ত আমাদের কাছে তত্ত্ব মাত্র কিন্তু তিনিই যখন ব্যক্ত হন আমরা তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারি। একদিকে বিশ্বের পরমপুরুষ আর একদিকে বিশ্বপ্রকৃতি অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্টি। এই দুই বস্তু ভিন্ন নহে আবার অভিন্নও নহে। ইহাদের মধ্যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদের সম্পর্ক, ইহা অচিন্ত্য, মানববুদ্ধির অতীত। ইহাই বৈষ্ণবের অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সিদ্ধান্ত অনুসারে একমাত্র ভক্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট ব্রহ্ম ও ভক্তের নিকট ভগবানরূপে প্রতিভাত হন। ভগবানের প্রতি পরম অনুরক্তিই ভক্তি। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

শাস্ত্র কহে কর্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত, সৃষ্টির সহিত, বিশ্বের পরমপুরুষের নিত্য আদান-প্রদান, নিত্য মিলন-বিরহের লীলা চলিতেছে। বৈষ্ণব দর্শনের ঈশ্বর-তত্ত্ব হইতেছে এই পুরুষপ্রকৃতি সমন্বিত যুগলত্ব। এই জন্যই বৈষ্ণব সাধকেরা যুগল উপাসনা করিয়া থাকেন। রাধা প্রকৃতির অর্থাৎ জীব ও জগতের প্রতীক। এই প্রকৃতির সঙ্গে (যিনি কৃষ্ণসৃষ্ট) পরমপুরুষের (কৃষ্ণের) নিত্য লীলা চলিতেছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম (বৈষ্ণবের কৃষ্ণ) আনন্দের জন্য যাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সঙ্গে তাঁহার নিত্যলীলা চলিবে ইহাই তো স্বাভাবিক।

এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমতটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—

> 'অসীমকে সীমার মধ্যে আনিয়া ভক্ত তাহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। আকাশ যেমন গৃহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াও অসীম এবং আকাশই সেইরূপ রাধাকৃষ্ণের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অসীম ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন। মানব মনে অসীমের সার্থকতা সীমাবন্ধনে আসিয়া। তাহার মধ্যে আসিলেই অসীম প্রেমের বস্তু হয়। নতুবা প্রেমাস্বাদ সম্ভবই নয়। অসীমের মধ্যে সীমাও নাই প্রেমও নাই। সঙ্গিহারা অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গ লাভ করিতে চায়—প্রেমের জন্য। ব্রহ্মের কৃষ্ণরূপ ও রাধারূপের মধ্যে এই তত্ত্বই নিহিত। অসীম ও সীমার মিলনের আনন্দই পদাবলীর রূপ ধরিয়াছে—সৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে।

বৈষ্ণব দর্শনে এই অসীম অর্থাৎ ব্রহ্ম পুরুষ আর সীমা অর্থাৎ জীব ও জগৎ প্রকৃতি। এই উভয়ের নিত্যলীলা আস্বাদন বৈষ্ণবের একমাত্র কাম্য। বাস্তব জগতের নর-নারীর প্রেমলীলার আধারেই এই পুরুষ-প্রকৃতির লীলাকে বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যে রূপ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের পুরুষাভিমান আছে বলিয়াই আমরা নিজেদের প্রকৃতির

অংশরূপে (স্ত্রীরূপে) ভাবিতে পারি না। কিন্তু স্বরূপতঃ আমরা তো প্রকৃতিরই অংশ। বাস্তব জগতে নর যেমন নারীকে আকর্ষণ করিতেছে, নারী যেমন পুরুষকে অনুসরণ করিতেছে, নর যেমন নারীকে ভোগ করিতে উৎসুক নারীও যেমন প্রেমিক পুরুষের নিকট আপন দেহ অর্ঘ্য দিয়া কৃতার্থ হয় তেমনই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এবং জীব ও জগৎরূপী প্রকৃতির নিত্যলীলা চলিতেছে। এই লীলারস উপলব্ধ করাইবার জন্য বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যে পরমপুরুষকে প্রেমিকপ্রবর চিরযৌবনসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং জীব ও জগৎরূপী প্রকৃতিকে অনন্ত-যৌবনা রাধারূপে কল্পনা করা হইয়াছে এবং এই প্রেমিকযুগলের প্রেমলীলা মানুষী প্রেমের আধারে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই তত্ত্ব না বুঝিয়া পুরুষ কি করিয়া স্ত্রীভাবে আরাধনা করিবে ইত্যাদি উক্তি দ্বারা বৈষ্ণব মতবাদকে নস্যাৎ করিবার চেষ্টা প্রগল্‌ভতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন—অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি।' এই দর্শনের মতে রাধাকৃষ্ণলীলারহস্যটি হইতেছে এইরূপ—

অখণ্ড, অব্যক্ত ও অদ্বিতীয় তত্ত্বের তিনটি স্তর অর্থাৎ সেই পরমার্থকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হইয়াছে—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান। ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি আছে কিন্তু তাঁহার শক্তির কোন স্ফূরণ নাই। তিনি অসীম ও সঙ্গীহারা। এই ব্রহ্মের মধ্যে যখন সৃষ্টির ইচ্ছা হইল তখন তাঁহার মধ্যে শক্তির উন্মেষ হইল এবং তখন তিনি পরমাত্মা। কিন্তু ব্রহ্মও নয় পরমাত্মাও নয় ভগবৎ তত্ত্বই বৈষ্ণবদের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। কারণ তিনিই হইতেছেন লীলাময়। এই লীলাময় ভগবানই শ্রীকৃষ্ণ, কারণ লীলার জন্য তিনিই জীব ও জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অবশ্য ব্রহ্মের এই সূক্ষ্ম বিভাগের তাৎপর্য উপলব্ধি করা দুরূহ। যিনি ব্রহ্ম,

তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ভগবান এবং এই তিন তত্বই শ্রীকৃষ্ণতত্ব এইভাবে বুঝিতে চাহিলেও কোন আপত্তি নাই। সৃষ্টির আদিতে যাহা সেই অসীম, অনন্ত বা অব্যক্তের সহিত আমাদের জীবনের কোন যোগ নাই। তাহা শুধু তত্ব মাত্র। সেই তত্ত্বেরই তিনটি স্তর—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান। বৈষ্ণবের কল্পনায় ভগবানকেই লীলাময় বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই ভগবানের মধ্যেই সমস্ত শক্তি নিহিত, তিনিই লীলার জন্য জগৎ ও জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। (শঙ্করাচার্যের মতে অসীম, অনন্ত, নির্বিকল্প, নির্বিকার ও নির্বিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক পরমাত্মা বা জগৎ ও জীব সৃষ্টিকারী লীলাময় ভগবান মায়া মাত্র। জগতের কোন অস্তিত্ব নাই, ইহাও মায়া। জীব ও ব্রহ্মে কোন প্রভেদ নাই। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিতে পারিলেই জগতের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। তখন জীবই ব্রহ্ম হইয়া যাইবে)।

বৈষ্ণবের কল্পনায় ভগবানের অনন্ত শক্তির তিনটি ভাগ:—(১) স্বরূপ শক্তি—যে শক্তি দ্বারা ভগবান নিজে আছেন। (২) তটস্থা শক্তি বা জীবশক্তি—অনন্ত কোটী জীব ভগবানের যে-শক্তির বৈভব। ভগবানের স্বর্গের বাহিরে সবই হইল জীব। জীব ভগবানের শক্তি হইতে উদ্ভূত। ভগবান জীবের সৃষ্টি করেন আবার তাঁহার যখন জীবের বিকাশ সংবরণের ইচ্ছা হয় তখন জীবের লোপ হয়। এই শক্তিকে তটস্থা শক্তিও বলে। নদীর তটে যেমন একদিকে জলের টান অপর দিকে মাটির টান—মানুষের মধ্যে তেমনি একদিকে ভগবান অপরদিকে জড় জগৎ। এই শক্তি অন্তরঙ্গা শক্তিও বটে। কারণ এই শক্তিই জীবকে ভগবৎ বিষয়ে উন্মুখ করে। (৩) ভগবানের যে-শক্তি দ্বারা জগতের সৃষ্টি তাহাই মায়াশক্তি। মায়া ভগবানের শক্তি হইলেও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মায়া ভগবানের প্রীতির জন্যই জগৎ সৃষ্টি করে কিন্তু ভগবানের সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। যেমন

আলোক ও অন্ধকার। একের পরিপ্রেক্ষিতে অপরের সার্থকতা কিন্তু দুই একসঙ্গে থাকে না।

ভগবানের স্বরূপশক্তি আবার তিন রকমের—(১) সৎ (২) চিৎ (৩) আনন্দ। ভগবানের স্বরূপ এই যে, তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দের দ্বারা পূর্ণ—অর্থাৎ তিনি পরিপূর্ণ আত্মা, পরিপূর্ণ চৈতন্য ও আনন্দ। ইহাঁদের কোনটিকে অন্য দুইটি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সৎ বলিতে বুঝি যে-শক্তিকে অবলম্বন করিয়া ভগবানের শক্তি বিধৃত। যে-শক্তিতে তিনি চেতন স্বরূপ তাহাই চিৎশক্তি। আবার যে-শক্তিতে তিনি আনন্দস্বরূপ তাহাই তাঁহার আনন্দশক্তি। আবার সৎ-শক্তিকে সন্ধিনী, চিৎ-শক্তিকে সম্বিৎ এবং আনন্দ-শক্তিকে হ্লাদিনী বলা হয়। এই হ্লাদিনী-শক্তির বলেই ভগবান সৃষ্টি করেন বা একমেবাদ্বিতীয়ম্ বহুধা বিভক্ত হন আনন্দের প্রাচুর্যে। এই শক্তির বলেই তিনি লীলাময়। অবশ্য লীলা বলিতে অস্তিত্ব এবং চৈতন্যকে বুঝাইলেও ইহারা নিতান্তই গৌণ। আনন্দ-শক্তি বা হ্লাদিনী-শক্তিই আসল। এই হ্লাদিনী-শক্তি দ্বারা সৃষ্ট জীবের সঙ্গে সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা চলিতেছে। শ্রীকৃষ্ণকে সৎ, চিৎ ও আনন্দের মূর্তিমান বিগ্রহ নরাকার ভগবানরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। আর হ্লাদিনীর মানবীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে ললিতা-বিশাখা-চন্দ্রাবলী-রাধা প্রভৃতিকে। ইঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ হ্লাদিনীর পূর্ণতম প্রকাশ ঘটিয়াছে শ্রীরাধিকায়। রাধা কৃষ্ণেরই অংশ (ভগবান আর তাঁহার হ্লাদিনী-শক্তি)। তাঁহারা তত্ত্বতঃ এক। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা পরকীয়া প্রেমের আধারে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই পরকীয়া তত্ত্বটি কি?

পরকীয়া তত্ত্ব—তত্ত্বের দিক হইতে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ কর্তৃক আপন আনন্দের আস্বাদনই হইল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অর্থ। তত্ত্বতঃ

রাধা ও কৃষ্ণ এক ও অভিন্ন এবং রাধা কৃষ্ণের আপন শক্তির অংশ বলিয়া কৃষ্ণের স্বকীয়। কিন্তু লৌকিক দিক দিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা আয়ানের বধূ, কাজেই যশোদানন্দন কৃষ্ণের পরকীয়া। জীব তত্ত্বের দিক হইতে কৃষ্ণের অংশ এবং তাঁহার স্বকীয়; কিন্তু সে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শযুক্ত জগতের সঙ্গে এমনভাবে নিজেকে জড়াইয়া ফেলে যে, সে তাহার আপন স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া কৃষ্ণের স্বকীয় মনে না করিয়া জগতের স্বকীয় মনে করে। জীব যখন এই স্বকীয় জগতের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভগবানের আহ্বানে সাড়া দেয় তখন তাহাই পরকীয়ার অভিসার রূপে প্রতিভাত হয়। ইহাই পরকীয়া তত্ত্ব। কিন্তু যেহেতু রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলাকে মানুষী প্রেমের আধারে রূপ দেওয়া হইয়াছে এইজন্য পরকীয়ার প্রেম ব্যাপারটিকে পরকীয়ার অভিসার প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বাস্তব জগতে দেখা যায় যে, পরস্ত্রী যখন পরপুরুষের সঙ্গে মিলিত হয় তখন আত্মীয়বর্গ, সামাজিক অনুশাসনের ভয় সব কিছুকে তুচ্ছ করিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়ে। তাহার প্রেমে থাকে এক সুতীব্র আকুলতা। ভগবানকে লাভের জন্য জীব যদি এইভাবে আত্মহারা হইতে পারে, সব কিছুকে অগ্রাহ্য করিয়া সেই পরমপুরুষের আহ্বানে সাড়া দিতে পারে তবেই তাহার জীবন ধন্য হইবে। এই উপলব্ধি যাহাতে জীবের মনে জাগ্রত হয় সেইজন্যই লৌকিকভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেম পরকীয়া প্রেমের মাধ্যমে লীলায়িত হইয়াছে। অন্যথায় এই লৌকিক সম্পর্কগুলি মায়িক মাত্র—শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি 'যোগমায়া'-র সৃষ্টি। (যোগমায়া বা মহামায়া বা বিষ্ণুমায়া ভগবানেরই শক্তি। ইনি শুধু জীবকে নয় ভগবানকেও মুগ্ধ রাখেন। আর এই মুগ্ধতাই তো লীলা। যশোদা শ্রীকৃষ্ণের ভগবৎরূপ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাইতেন কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে আবার পরক্ষণেই তাঁহাকে পুত্র ছাড়া আর অন্য কিছু ভাবিতে পারিতেন না। কারণ

তাহা না হইলে তো নরবপুধারী কৃষ্ণের সর্বোত্তম লীলা নরলীলা সার্থক হয় না। কৃষ্ণ ও রাধা ইত্যাদি গোপীগণকে লীলায় মুগ্ধ রাখা এই যোগমায়ারই কাজ। সহজিয়া বৈষ্ণবগণের মতে যোগমায়াই নিত্য রাধা। তত্ত্বের দিক দিয়া যোগমায়া রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার সাহায্য-কারিণী। যোগমায়াকে উপাসনা না করিলে কৃষ্ণকে জানা যাইবে না। কারণ বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত করিয়া তিনিই জীবকে ভগবদভিমুখী করিয়া তোলেন)।

গোপীতত্ত্ব বা সখীতত্ত্ব—শ্রীরাধাই হ্লাদিনীর সার। কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার নিত্যলীলা। হ্লাদিনীর মানবীরূপে একা রাধাকে কল্পনা না করিয়া ললিতা-বিশাখা-চন্দ্রাবলী ইত্যাদিকেও কল্পনা করা হইল কেন? রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা মধুর রসের লীলা। ভক্ত জীবের (নারীপুরুষ নির্বিশেষে জীব কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির অংশ) প্রতীক হইতেছেন রাধা। কৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গে মধুর লীলায় রত। এই লীলাকে মধুরতম করিয়া প্রকাশ করিবার জন্যই লীলার সহায়িকা বা 'লীলা-বিস্তারিকা' সখীদের আবির্ভাব। প্রেমিকা রাধার চিত্তের বিভিন্ন বৃত্তির রূপ এই সখীদের মধ্য দিয়া প্রকটিত হইয়াছে। অর্থাৎ সখীরা রাধার 'কায়ব্যূহ'—সমস্ত সখীদের মিলিতরূপ রাধা। রাধাহীন সখীবৃন্দ এবং সখীহীন রাধার কল্পনা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা এই দুই সখী সঙ্গে ছিল না বলিয়াই দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনিতে পারেন নাই। তেমনি সখীবিহীন রাধার কল্পনা করা যায় না—সখী বাদ দিলে রাধাকৃষ্ণের প্রেমরসের আস্বাদ অনেক কমিয়া যাইবে। ঐ প্রেমলীলার রস পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করিবার জন্যই রাধার সমগুণশালিনী সখীদের কল্পনা।

সাধ্য-সাধন তত্ত্ব—রাধা কৃষ্ণেরই অংশ এবং তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম বা কৃষ্ণরতি স্বভাবসিদ্ধ। এইজন্যই তাঁহার ভক্তি সাধ্যভক্তি। ললিতা-

বিশাখা প্রভৃতি সখীদের ভক্তিও সাধ্যভক্তি। জীবের মধ্যেও গোপী-সম্ভাব্যতা রহিয়াছে কারণ জীবও কৃষ্ণের অংশ। কিন্তু মায়ার প্রভাবে আপন স্বরূপ-সম্বন্ধে জীব অচেতন। কেবলমাত্র সাধনার দ্বারাই এই চেতনার জাগরণ সম্ভব। কাজেই জীবের কৃষ্ণভক্তি সাধনভক্তি অর্থাৎ সাধনা সাপেক্ষ। ইহাই সাধ্য-সাধন তত্ত্ব।

বৈধীভক্তি ও কান্তাপ্রেম—জীবের সাধনভক্তি প্রথম পর্যায়ে শাস্ত্রবিধান অনুযায়ী অগ্রসর হইবে। অর্থাৎ কৃষ্ণের মহিমা স্মরণ, কীর্তন এবং কৃষ্ণকে দাস্য, সখ্যভাবে অর্চনা-বন্দনা করিয়া আত্মনিবেদন করিতে হইবে। ইহাই বৈধীভক্তি। বৈধীভক্তি দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে মনে প্রেমের উদয় হইবে এবং তখনই কান্তভাবের সাধনার সূত্রপাত হইবে। অর্থাৎ কৃষ্ণ কান্ত আমি কান্তা অর্থাৎ গোপীর অনুগত পন্থায় চলিবে কান্তভাবের সাধনা। ইহাই কান্তাপ্রেম।

রাগাত্মিকা ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি—গোপীর আত্মার মধ্যেই কৃষ্ণপ্রেম নিহিত। স্বতঃই সেই প্রেমের প্রকাশ হইয়া থাকে। তাঁহার হৃদয়ে এই কৃষ্ণের প্রতি 'রাগ' তাহা সাধনলব্ধ নহে, ইহা জন্মগত। তাই চণ্ডীদাসের রাধা বলেন; 'শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে পরাণে পরাণে নেহা'। এই জন্মলব্ধ 'রাগ'-এর জন্যই কৃষ্ণপ্রেম বরণের দুঃখ পরমসুখ বলিয়া মনে হয়ঃ 'তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ'। গোপীর এই ভক্তিকে বলে রাগাত্মিকা। কিন্তু জীবের রাগ সাধনা দ্বারা জাগ্রত হয়। এই সাধনা করিতে হয় গোপীর রাগের অর্থাৎ প্রেম-ভক্তির অনুসরণ করিয়া। যেন গোপী পথপ্রদর্শক গুরু আর জীব তাঁহার অনুগত শিষ্য। জীব ললিতা-বিশাখা সখীদের সঙ্গে বসিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা দর্শন করিতে পারিলে এবং এই যুগলের সেবা করিতে পারিলেই নিজেকে ধন্য মনে করে। যেমন,—

দুই মুখ নিরখিব দুই অঙ্গ পরশিব
সেবা করিব দোঁহাকার ॥
ললিতা-বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানাফুলে।
কনক সম্পূট করি কর্পূর-তাম্বুল ভরি
যোগাইব অধরযুগলে ॥

গোপীর রাগের অনুগত পন্থায় জীবের সাধনা চলে বলিয়া জীবের ভক্তিকে বলা হয় রাগানুগা ভক্তি। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদ ধর্ম সর্ব ত্যজি সেই কৃষ্ণে ভজয় ॥
রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥

রাগাত্মিকা ভক্তিযুক্ত মধুর রসের কৃষ্ণভজনাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মতে শ্রেষ্ঠ পন্থা। নররূপী শ্রীকৃষ্ণের লীলা আস্বাদনই বৈষ্ণবতা। এই লীলার রস শান্ত, দাস্য, সখ্য বা বাৎসল্য হইতে পারে কিন্তু মধুর রসই শ্রেষ্ঠ রস। বৈষ্ণব পদাবলীতে মানবিক প্রেমের আধারে এই রসকে উজ্জ্বল করিয়া পরিস্ফূট করা হইয়াছে। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে মহাপ্রভু রায় রামানন্দের সঙ্গে আলোচনাকালে কান্তভাবে সাধনার (সাধ্য-সাধনতত্ত্ব) তত্ত্বটি বিকশিত করেন। রায় রামানন্দ ছিলেন উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের (১৪৮৯-১৫৪০ খৃঃ অব্দ) একজন প্রধান রাজপুরুষ। তাঁহার রাজধানী ছিল বিদ্যানগর—বর্তমান রাজমাহেন্দ্রী।

এই রাজমাহেন্দ্রীতেই মহাপ্রভুর সঙ্গে রামানন্দ রায়ের মিলন ঘটিয়াছিল। মহাপ্রভু প্রশ্ন করিতেছেন, রায় উত্তর দিতেছেন, এইভাবে

সাধ্য সাধনতত্ত্বটি নিরূপিত হইল। কবিরাজ গোস্বামী এই তত্ত্বনিরূপণের বর্ণনাটি এইভাবে করিয়াছেন—

নমস্কার কৈলা রায় প্রভু কৈলা আলিঙ্গনে।
দুইজনে কৃষ্ণকথা বসি রহঃ স্থানে ॥
প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম ত্যাগ এই সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্বসাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্যপ্রেম সর্বসাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্বসাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্বসাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাভাব সর্বসাধ্য সার ॥

মধুর রসেতে কান্তাভাবের সাধনা করিতে হইবে। এই মধুর রস সকল রস হইতে শ্রেষ্ঠ :—

পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাঢ়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥

প্রভু তখন কহিলেন—

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥

মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসার অন্ত নাই। তাঁহার অতঃপর প্রশ্ন এই যে, রাধার প্রেমই যদি সাধ্য শিরোমণি হয় তবে গোপীগণের দৃষ্টি এড়াইয়া রাধাকে লইয়া তিনি রাসমণ্ডল ত্যাগ করিয়াছিলেন কেন? যদি রাধাকেই তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন তবে তো তিনি রাধার সামনেই গোপীদিগকে ত্যাগ করিতে পারিতেন। এই যে, গোপীগণের প্রতি ভয় ইহাতে তো রাধার প্রতি প্রেমের গাঢ়তা বুঝাইতেছে না। তদুত্তরে রায় কহিলেন যে, কৃষ্ণের সংসারবাসনায় বাঁধিবার শৃঙ্খল

হইতেছেন শ্রীরাধা। শতকোটী গোপীর দ্বারা এই বাসনার নিবৃত্তি হয় না। তাই তিনি গোপীগণকে ত্যাগ করিয়া রাধাকে লইয়া প্রেমক্রীড়ায় মত্ত হইলেন। কৃষ্ণকে অন্য গোপীগণের সঙ্গে বিলাসমত্ত দেখিয়া রাধা মানিনী হইয়াছিলেন। কারণ রাধাই কৃষ্ণের মায়ার মূর্তিমতী বিগ্রহ। অন্যান্য গোপীদের মধ্যে রাধার বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির রূপ দেখা যায় কিন্তু রাধা তাহাদের সম্মিলিত রূপ।

শতকোটি গোপী সঙ্গে রাস বিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্তি রহে রাধা পাশ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তারে না দেখিয়া ইহাঁ ব্যাকুল হইলা হরি॥
সম্যক বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥
তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হইয়া॥
শত কোটি গোপীতে নাহি কাম নির্বাপণ।
ইহা হইতে অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥

তারপরও প্রভু রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও জানিতে চাহিলে রায় বলিলেন—

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥

হ্লাদিনীর সার ফল প্রেম তার নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান ॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য তাঁর ॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহ রূপ ॥

প্রভু তবুও জিজ্ঞাসা করিলেন—

প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর।
রায় কহে ইহা বই বুদ্ধি গতি নাহি আর ॥
যেবা প্রেম-বিলাস-বিবর্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয় ॥

প্রেম-বিলাস বৈবর্ত—বিবর্ত মানে ভ্রম। প্রেমিক ও প্রেমিকার (কৃষ্ণ ও রাধার) মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে যে দ্বৈততা দেখা যায় তাহা ভ্রম মাত্র। প্রেমের জগতে অভেদই সত্য। যখন প্রেমের পরাকাষ্ঠা হয় তখন প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। বাস্তব জীবনেও দেখা যায় যে প্রেমিকা নারী যখন প্রেমাস্পদকে সানুরাগ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন তখন ক্ষণিকের জন্য হইলেও দুই দেহ, দুই মন এক হইয়া যায়। ইহাই প্রেম-বিলাস বিবর্ত। রাধা ও কৃষ্ণ মূলতঃ এক। লীলার জন্যই তাঁহাদের ভিন্ন মূর্তি। মহাপ্রভু রামানন্দের মুখ দিয়া বৈষ্ণবের এই চরম অনুভূতিটি ফোটাইয়া তুলিলেন। রায় একটি গান গাহিয়া এই তত্ত্বটি প্রকাশ করিলেন।

এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল ॥

গীতটি হইতেছে এই—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি ॥
এ সখি সে সব প্রেম কাহিনী।
কানুঠাম কহবি বিছুরহ জানি ॥
না খোঁজলু দূতী না খোঁজলু আন।
দুঁহুক মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ ॥
অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুষ প্রেমকি ঐছন রীতি ॥
বর্দ্ধন রুদ্র নরাধিপ মান।
রামানন্দ রায় কবি ভান ॥

প্রথমেই রাগ—পূর্বরাগের উদয় হইয়াছিল। পরে নয়ন ভঙ্গীতে পরিচয় ঘটিয়াছিল। পরিচয়ে প্রেম প্রগাঢ় হইয়া দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছিল। তাহার শেষ পাওয়া যায় নাই। সে রমণ, আমি রমণী নহি, সে ভোক্তা, আমি ভোগ্যা-মাত্র নহি। (সে রমণ, আমি রমণী এ চেতনাও তখন ছিল না।) তথাপি মনোভব আমাদের মনকে পিষ্ট করিয়াছিল। (দুইজনের প্রীতি পরস্পরের মনকে গলাইয়া মিলাইয়া দিয়াছিল।) সখি, সেই সব প্রেম-কাহিনী কানুর নিকট কহিও, যেন ভুলিও না। তখন তো কোন দূতী খুঁজি নাই। অন্য কাহারো অনুসন্ধান করি নাই। দুজনের মিলনে পঞ্চবাণই (মদনই) আমাদের মধ্যস্থ ছিল। এখন তাহার বিরাগে তুমি দূতী হইয়াছ। সুপুরুষের

(উত্তম নায়কের) প্রেমের কি এই রীতি ! কবি রামানন্দ বলিতেছেন—শ্রীরাধার মান রুদ্র (প্রচণ্ড) রাজ্যেশ্বরের মত বর্ধিত হইয়াছে। (প্রচণ্ড মান শ্রীরাধার মনে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে) অথবা মহারাজা প্রতাপরুদ্র কর্তৃক বর্ধিতমান কবি রামানন্দ রায় ইহা বলিতেছেন। (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ)।

রাধা-প্রেমের এই চরম পরিণতিতে এই প্রেম-বিবর্ত-বিলাস কাহিনী শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু আবেগে ফুলিতে লাগিলেন এবং রায়ের মুখ স্বহস্তে আচ্ছাদন করিলেন। বৈষ্ণবের যুগল উপাসনার ইহাই শেষ কথা। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মর্মবাণী।

কাম ও প্রেম—সাধ্য-সাধনতত্ত্বে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, জীবের কৃষ্ণভক্তি সাধনা সাপেক্ষ। এই সাধনভক্তি প্রথম পর্যায়ে শাস্ত্র বিধান অনুযায়ী অগ্রসর হইবে। অর্থাৎ কৃষ্ণের মহিমা স্মরণ, কীর্তন এবং কৃষ্ণকে দাস্য, সখ্যভাবে অর্চনা-বন্দনা করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ইহা দ্বারা চিত্ত বিমুগ্ধ হইলে মনে প্রেমের ছায়াপাত হইবে তখনই গোপীর অনুগত পন্থায় চলিবে কান্তভাবের সাধনা।

> সাধনভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
> রতি গাঢ় হৈলে তারে প্রেমনাম কয়॥
> প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে স্নেহ মান ও প্রণয়।
> রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥

বৈষ্ণব আলঙ্কারিকদের মতেও প্রেম ক্রমান্বয়ে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং মহাভাবে উল্লসিত হয়। গৌরাবতার ছিলেন রাধাভাবে অনুপ্রাণিত। কিন্তু ভক্ত-সাধারণের জন্য তিনি সখীর আনুগত্যে রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবার উপদেশ দিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের রতিক্রীড়া দেখিয়া গোপীগণের যে-আনন্দ হয় গোপীভাবে সাধনা করিলে জীবেরও সেই আনন্দ হইবে। সেই অপ্রাকৃত মানস প্রেমলীলা

উপলব্ধিতে নিজের কামবৃত্তির চরিতার্থতা হইতে কোটিগুণ বেশী আনন্দ হইবে।

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় সখীর নাহি মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পুষ্প পল্লব পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজসেক হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥
যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ সঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥
নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মকৃষ্ণ সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়॥

অপরের মিলন-দৃশ্য দেখিয়া সাধারণ মানুষের কামগন্ধহীন প্রীতির উদ্ভব হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সাধনভক্তি দ্বারা মন নির্মল হইলে এই আনন্দের সৃষ্টি হইতে পারে। যে-তত্ত্বদৃষ্টিতে বৈষ্ণবেরা শ্রীভগবানের লীলাকে ব্যাখ্যা করেন তাহাতে ইহা মোটেই অসম্ভব নহে। এই স্বর্গীয় প্রেমকে দেহের সম্বন্ধ হইতে বিযুক্ত হইয়া আস্বাদন করিতে হইবে।

কাম ও প্রেম মূলে এক। কামের মাত্রাধিক্য হইলেই তাহা রিপুতে পরিণত হইয়া যায়। এই কাম রিপুকে জয় করাই সকল সাধনার গোড়ার কথা। তান্ত্রিকরা কামের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া কামকে জয় করেন। উত্তরসাধিকা বা ভৈরবীর সঙ্গে যৌনসঙ্গমে রত হইয়াও তাঁহারা তাঁহাদের সাধ্যবস্তু মুক্তির কথা ভুলিয়া যান না। কামকে তাঁহারা সাধনার প্রক্রিয়া হিসাবে গ্রহণ করেন এবং এক সময়

এই প্রক্রিয়াকে বাদ দিয়াই মুক্তির আস্বাদ পান। কোন কোন উপাসনায় ব্রহ্মচর্যকে স্বীকার করিয়া কামকে একেবারেই অস্বীকার করা হইয়াছে। সহজিয়া পন্থীরা কামকে সাধনরূপে স্বীকার করেন। বৈষ্ণবেরা কামকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তাহা দেহের সঙ্গে সম্পর্কহীন নির্মল ভাবরূপে। তাঁহাদের মতে কাম ও প্রেম এক ও অভিন্ন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় নিজেদের কামকে সমর্পণ করিয়া তাঁহারা সেই স্বর্গীয় প্রেমের অলৌকিক রসে নিজেদের চিত্তকে অভিষিক্ত করেন। তাঁহাদের মতে সাধনভক্তি দ্বারা মনকে সেই নির্মল অবস্থায় উন্নীত করা যাইতে পারে। কামকে প্রেমে রূপান্তরিত করিতে পারিলেই কাম ও প্রেম এক হইয়া যায়। অন্যথায় কাম রিপুতে পরিণত হয়।

> কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
> লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
> আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
> কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম॥
> কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
> কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য মাত্র প্রেম ত প্রবল।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণবেরা মুক্তিকে ঘৃণা করেন। কারণ জীব হইয়া জন্মগহণ করিবার ফলেই তো রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা আস্বাদনের সুযোগ মিলিয়াছে—এ যে, পরম সৌভাগ্যের কথা। তাঁহারা কলিযুগকেও সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং এই যুগকে প্রণাম জানাইয়াছেন। কলিযুগেই রাধাকৃষ্ণের যুগলবিগ্রহ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্ম হইয়াছে এবং তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহার লীলামাধুর্য শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করিয়া জীব ধন্য হইয়াছে ও হইতেছে।

দ্বৈতভাবের লোপ—রাধা ও কৃষ্ণে মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই, তাঁহারা তত্ত্বতঃ এক একথা আমরা জানিতে পারিয়াছি। রাধাভাবে ভাবিত জীবাত্মা যখন পরমাত্মা কৃষ্ণের সঙ্গে ভাব বৃন্দাবনে লীলাবিলাসে, প্রেমলীলায় নিমগ্ন থাকেন তখন দ্বৈতভাবের লোপ হয়। কামের দিক দিয়াও একথার সত্যতা যাচাই করা যায়। যৌন মিলনকালে প্রেমিক-প্রেমিকার যেমন বাহ্য ও অন্তর ভেদ থাকে না তেমনই জীবাত্মা-পরমাত্মা লীলা বিলাসে যখন নিমগ্ন থাকেন (অনুক্ষণই এই বিলাস চলিতেছে) তখন দ্বৈতত্বের লোপ হয়। সেইজন্যই তো, 'না সো রমণ, না হাম রমণী'।

গৌরতত্ত্ব—শ্রীচৈতন্যদেবকে তাঁহার ভক্তমণ্ডলী এক বিশেষ লীলা-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই হিরণ্যদ্যুতি সন্ন্যাসীকে তাঁহারা রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ বলিয়া মনে করিতেন। গৌরচন্দ্র ছিলেন বহিরঙ্গে রাধা, অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ। অপ্রাকৃত গোলোকধামে রাধাকৃষ্ণের লীলা তাঁহার জীবনে প্রকট হইয়াছিল। বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে তিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার আবির্ভাবের কারণটি হইতেছে এই—শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, শ্রীরাধা আমার যে মাধুর্য আস্বাদন করেন তাহা কি প্রকার এবং আমার অনুভবজনিত সুখধারা কিভাবে শ্রীরাধার অন্তরে অনুভূত হয় এই তিনটি বস্তুর লোভে শ্রীহরিরূপ চন্দ্র শচীর গর্ভ-সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন। রূপ গোস্বামীর কথায়—চির অনর্পিত যে-মধুররসাশ্রিত ভক্তিসম্পদ তাহাই সম্যক প্রকারে দান করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য কৃপা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নদীয়ায় একা অবতীর্ণ হন নাই। শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া, একাত্ম হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন।

শ্রীরাধার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিত্যরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥

মহাপ্রভু ছিলেন 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' কৃষ্ণস্বরূপ। মহাপ্রভু রাধাভাবে ভাবিত হইয়া কৃষ্ণভজনা করিতেন বলিয়া বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাভাবেরই প্রাধান্য বেশী। তাঁহার ভক্তমণ্ডলী কান্তা গৌরচন্দ্রের ও কান্ত শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছিন্ন মানসলীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার মহিমা উপলব্ধি কারতে পারিয়াছিলেন। অন্যথায়, 'রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা জগতে জানাত কে'।

সহজিয়া-তত্ত্ব—মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক বৃত্তিকে (অর্থাৎ কাম-প্রবৃত্তিকে) স্বীকার করিয়া তাহাকেই সাধনপন্থা রূপে গ্রহণ করাই সহজিয়া-তত্ত্ব। এই মত খুবই প্রাচীন। খৃষ্টপূর্ব তিনশত বৎসরেরও পূর্বে বৌদ্ধ 'সমভিপ্রায়ী'-র দল এই মতবাদের গোড়াপত্তন করেন। ঐ সময়ে একদল ভাবুক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বৌদ্ধবিহারে একত্রে বসিয়া ধর্মালোচনা করিতেন বলিয়া ভিক্ষুসমাজে তাঁহারা বিশেষ নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম-দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে যখন বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার বিশেষ প্রভাব তখন এই মতটি এখানে প্রসার লাভ করে। এই মতবাদ অনুসারে জৈবিক প্রবৃত্তিগুলির তৃপ্তি সাধনের মধ্য দিয়া মনে আনন্দময় উপলব্ধির সঞ্চারই শ্রেষ্ঠ সাধন-পদ্ধতি। এই মতে ব্যক্তিগত সাধন-শক্তির উপরই জোর দেওয়া হইয়াছিল ধর্মাচরণের এই সহজ পন্থানুসরণের পশ্চাতে তত্ত্ববস্তুর একটা সাধারণ স্বীকৃতি ছিল মাত্র। চর্যাপদে এই সাধন পদ্ধতির গোপন ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে। আবার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একদল ঐ সাধনপদ্ধতিকে উপায় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কামের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া তাঁহারা কামকে জয় করিতে চাহিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসকে অনেকে এই সহজিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক বলিয়া মনে করেন। রামী ছিল তাঁহার সাধন-সঙ্গিনী। জয়দেব সম্পর্কেও এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

চণ্ডীদাসের নামে কিছু পদ প্রচলিত আছে যাহাতে ঐ প্রকার পদ্ধতির ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে।

চণ্ডীদাসের সহজ-সাধন সম্পর্কিত একটি বিখ্যাত পদের অংশ—

পর পতি সনে সদাই গোপনে
সতত করিবি লেহা।
নীর না ছুঁইবি সিনান করিবি
ভাবিনী ভাবের দেহা॥
তোরা না হইবি সতী না হবি অসতী
থাকিবি লোকের মাঝে।
চণ্ডীদাস কহে এমনি হইলে
তবে ত পিরীতি সাজে॥

সহজিয়া সাধনে তান্ত্রিকদের মত সাধকের একজন সঙ্গিনী দরকার। চণ্ডীদাসের সঙ্গিনী ছিলেন রজকিনী রামী। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সাধক ও তাঁহার সঙ্গিনীর মধ্যে কামের কোন স্থান নাই। 'রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়।' সহজ সাধনে পরকীয়া প্রেম অবলম্বনীয়। এই পরকীয়া প্রেমই পরবর্তী যুগে বৈষ্ণব সাধন পদ্ধতিতে এক গূঢ়তর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য লইয়া দেখা দিয়াছে এবং বৈষ্ণব পদাবলীকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

———

বৈষ্ণব মতে রস

মানুষের মনে অগণিত ভাবরাশি অহর্নিশি সমুদ্রের তরঙ্গের মত উত্থিত এবং লয়প্রাপ্ত হইতেছে। এই ভাবরাশির মধ্যে কতকগুলি ভাবকে স্থায়ীভাব বলা যাইতে পারে। এই ভাব বা বৃত্তিগুলি চিরন্তন। ইহাদের কোন বিনাশ বা পরিবর্তন নাই। আলঙ্কারিকরা এই স্থায়ী ভাবগুলির সংখ্যা আটটি নির্ধারণ করিয়াছেন—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়। ইহারা আমাদের মনের মধ্যে সংস্কাররূপে বিদ্যমান আছে। উপযুক্ত অবস্থায় ইহারা রসে পরিণতি লাভ করে। আটটি ভাব হইতে আটটি রসের পরিণতি হয়—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত। রতি এই স্থায়ীভাবের রস হইতেছে শৃঙ্গার রস। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তমনের রতিকে বা স্থায়ী ভাবকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—শম, সেবা, বিশ্বাস (বিস্রম্ভ), বৎসলতা এবং মধুরা। এই পঞ্চ-প্রকার স্থায়ীভাব হইতে পঞ্চপ্রকার রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ বৈষ্ণব মতে রস পাঁচ প্রকার—(ক) শান্ত (খ) দাস্য (গ) সখ্য (ঘ) বাৎসল্য (ঙ) মধুর অর্থাৎ শৃঙ্গার।

(ক) **শান্তরস**—শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বস্তু। তিনি সর্বৈশ্বর্যশালী। তাঁহার সঙ্গে আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক আসিতে পারে না। তাই ভক্ত বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সেই ঐশ্বর্যশালী পরম-পুরুষের শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করেন। বৈষ্ণব পদাবলীর 'প্রার্থনা' বিষয়ক পদগুলি শান্তরসের অন্তর্ভুক্ত। যেমন,—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,
সাগর-লহরী সমানা॥

(খ) **দাস্য**—কৃষ্ণ পরম শক্তিমান, তিনি ঐশ্বর্যশালী, ভক্ত শক্তিহীন এবং দীন-দরিদ্র। ঐশ্বর্যশালী ভগবানকে ভক্ত প্রভুর মত গণ্য করেন এবং নিজেকে তাঁহার ভৃত্য বলিয়া ভাবেন। সেবার মনোভাবই এখানে ভক্তকে উদ্বুদ্ধ করে। সেবায় ভক্ত-ভগবানে মমত্বের সম্পর্কটিও কিয়ৎ পরিমাণে জাগিয়া উঠে।

শান্ত বা দাস্য রসের পদ চৈতন্যোত্তর যুগে প্রায় রচিত হয় নাই বলিলেই চলে। কারণ চৈতন্যদেব জীব ও ভগবানের মধ্যে যে সম্পর্কের কথা বলিলেন এবং যাহাকে ভিত্তি করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন রূপ পরিগ্রহ করিল তাহাতে শান্ত ও দাস্য রসের কোন স্থান নাই।

(গ) **সখ্য**—ভগবান ও ভক্তের মধ্যে এখানে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। পরস্পরের বিশ্বাস ও সমপ্রাণতার মধ্য দিয়া এই সম্পর্কটি গড়িয়া উঠে। ভগবানের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্যে তাঁহার প্রতি নিষ্ঠা ও সেবার সঙ্গে সমপ্রাণতার ভাবটিও বিদ্যমান থাকে। এই সমপ্রাণতার ফলে ভক্তই শুধু ভগবানকে সেবা করেন না, ভগবানও ভক্তকে সেবা করিয়া থাকেন। উদ্ধব দাস, বলরাম দাস, যাদবেন্দ্র, বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি কবিগণ সখ্য রসের বহু পদ রচনা করিয়াছেন।

সখ্য রসের পদের একটি উদাহরণ—

বিবিধ কুসুম দিয়া সিংহাসন নিরমিয়া
কানাই বসিলা রাজাসনে।
রচিয়া ফুলের দাম ছত্র ধরে বলরাম
গদ গদ নেহারে বদনে॥
অশোক-পল্লব করে সুবল চামর করে
সুদামের করে শিখিপুচ্ছ,
ভদ্রসেন গাঁথি মালে পরায় কানাইয়ের গলে
শিরে দেয় গুঞ্জাফল-গুচ্ছ॥

(ঘ) **বাৎসল্য রস**—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তের এখানে পিতা-পুত্র বা মাতা-পুত্রের সম্পর্ক। এইখানে ভগবানের প্রতি একটি মমতার সম্পর্ক বিদ্যমান। বাৎসল্য রসের একটি উদাহরণ—

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ-ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপু ভয় আছে॥

যাদবেন্দ্র, বলরাম দাস এবং বাসুদেব ঘোষ বাৎসল্য রসের পদ রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

(ঙ) **মধুর রস**—মধুর রসের ভজনাই বৈষ্ণবের একমাত্র কাম্য বস্তু। রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব নির্ণয় প্রসঙ্গে কান্তা প্রেমই যে সর্ব-সাধ্য সার এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হয়—

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্বসাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্য প্রেম সর্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্বসাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তা ভাব সর্বসাধ্য সার॥

মধুর রসে ভগবান কান্ত, ভক্ত কান্তা। 'শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের বিশ্বাস, বাৎসল্যের লালন ও মধুরের কান্তভাব, এই পাঁচটির গভীর এবং আতিশয্যময় মিলনে মধুর রস। ইহার স্থায়ী ভাব 'মধুরা' নামে রতি। শান্তে ভগবানকে ভালবাসার প্রশ্নই উঠে না। ভালবাসার সূচনা দাস্যে এবং সখ্য, বাৎসল্যের ভিতর দিয়া চরম পরিণতি মধুরে।'

'মধুরা' রতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা।

'কৃষ্ণের রূপ লাবণ্যে, তাঁহার সঙ্গলাভে নিজের ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার ঐকান্তিক বাসনা হইতে যে রতি ভক্তহৃদয়ে উদ্ভূত হয়, তাহাই 'সাধারণী', কৃষ্ণের গুণাদি-শ্রবণে শাস্ত্রসম্মত পরিণয় বন্ধনের দ্বারা পারস্পরিক সমসুখলাভের বাসনা হইতে যে রতি ভক্তহৃদয়ে উদ্ভূত হয়, তাহার নাম 'সমঞ্জসা'। ভক্তহৃদয়ে যে কৃষ্ণরতি স্বতঃসিদ্ধ, ভগবানের (ভক্তের নিজের নহে) তৃপ্তিসাধনই যাহার একমাত্র লক্ষ্য, যাহার কাছে সংসার সমাজ সব মিথ্যা হইয়া যায়, যাহার প্রভাবে ভগবান ভক্তের বশীভূত হন, তাহাই সমর্থা রতি'। (শ্যামাপদ চক্রবর্তী)। মধুর রসের একটি অনবদ্য নিদর্শন চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে তুলিয়া দেওয়া হইল—

কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম-বেদনা
সদাই চমকে চিত॥
গুরুজন-আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছলছল আঁখি।

পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি ॥
সখীর সহিতে জলেতে যাইতে
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ঝলমল
তাহে কি পরাণ রয় ॥
কুলের ধরম রাখিতে নারিনু,
কহিলুঁ সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাস শ্যাম সুনাগর
সদাই হিয়ায় জাগে ॥

রসাভাস—রসাভাস শব্দটির অভিধানিক অর্থ হইতেছে পরিবেশ বা বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে রস পরিবেশন বা বর্ণনা অর্থাৎ নীচ বা অনুচিত বর্ণনা বা রস। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই রসাভাস কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। বৈষ্ণব পদাবলীতে রসাভাস একটি অমার্জনীয় অপরাধ। যেমন, বৈষ্ণব পদে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের বর্ণনা দেওয়া চলে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ রাধাকে বশীভূত করিবার জন্য নিজের অপরিসীম ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের কথা বলিয়াছেন। ইহাতে রসাভাস ঘটিয়াছে। মাথুর পালা-কীর্তনের গৌরচন্দ্রিকা হইবে চৈতন্যদেবের রাধাভাবে ভাবিত বিরহাকুল অবস্থার বর্ণনা। তা না করিয়া কেহ যদি মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের বা বাল্যলীলার পদ গায় তবে তাহাতে রসাভাস ঘটিবে।

বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা

পদাবলী—পদাবলী কথাটির অর্থ হইতেছে পদসমূহ। কিন্তু পদাবলী বলিতে মহাজন-পদাবলী বা বৈষ্ণব পদাবলীকেই বোঝায়। আজকাল অবশ্য শ্যামাসঙ্গীতকেও পদাবলী বলা হইয়া থাকে। পদাবলী কথাটি সর্বপ্রথম জয়দেব তাঁহার গীত-গোবিন্দে ব্যবহার করিয়াছেন এবং এইজন্যই বৈষ্ণব পদাবলী অর্থেই এই কথাটির বিশিষ্ট প্রয়োগ।

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্॥

—যদি হরিস্মরণে মনকে সরস করিবার বাসনা থাকে, যদি তাঁহার বিলাসকলা জানিবার কৌতূহল হয়, তবে জয়দেব রচিত এই মধুর কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ করুন।

প্রাক্‌-চৈতন্য যুগ—রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই বৈষ্ণব পদাবলীর উপজীব্য বিষয়। এই রাধাকৃষ্ণলীলাকথা কোন্ প্রাচীন যুগে সাহিত্যে রূপ পাইল তাহা নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। বাঙ্গলা সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বিদ্যাপতির পদাবলীতে প্রথম স্থান লাভ করিল। বিদ্যাপতি যদিও ব্রজবুলিতে তাঁহার পদ রচনা করিয়াছিলেন তবুও ইহা বাঙ্গলা সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত। বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির আবির্ভাবের পূর্বে জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাধাকৃষ্ণলীলার একটি পূর্ণাঙ্গরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। গীতগোবিন্দ অবশ্য সংস্কৃতে রচিত। বলাই বাহুল্য, গীতগোবিন্দে অকস্মাৎ এই লীলাকাহিনীর রূপটি প্রকটিত হয় নাই। ইহার পূর্বে নিশ্চয়ই এই প্রেম-কাহিনীর একটি ধারা প্রবাহিত হইতেছিল।

কৃষ্ণের কথা বহু পুরাণাদিতে উল্লেখ থাকিলেও রাধার উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই না। 'বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে শ্রীরাধার আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ মূলতঃ ভারতবর্ষের সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া। মনে হয়, ব্রজের রাখাল-কৃষ্ণের গোপীগণের সহিত যে-প্রেম-লীলা তাহা প্রথমে আভীর জাতির মধ্যে কতকগুলি রাখালিয়া-গানরূপে ছড়াইয়া ছিল। চপল আভীর বধূগণ এবং নবযৌবনে অনিন্দ্যসুন্দর গোপযুবক কৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলার উপাখ্যান গোপজাতির মধ্যে অনেক গানের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। গান-ছড়ার মাধ্যমেই হয়ত এগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে প্রচারলাভ করিতেছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করার পরে বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা আস্তে আস্তে পুরাণগুলিতে স্থান পাইয়া কবিকল্পনায় আরও পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কৃষ্ণের এই বিচিত্র গোপী-লীলার কাহিনীর ভিতরে একটি বিশেষ গোপী রাধার সহিত কৃষ্ণের বিশেষ প্রেমলীলার কিছু কিছু কাহিনী একটি ফল্গুধারার ন্যায় ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রেম সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল বলিয়া মনে হয়। বিষ্ণু-পুরাণ এবং ভাগবতের রাসবর্ণনার ভিতরে তাহারই সাক্ষ্য পাওয়া যাইতেছে, আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু সাক্ষ্য মিলিতেছে প্রাচীন ভারতের কতকগুলি প্রেম-সঙ্গীতের সঙ্কলনে—কিছু কিছু লিপিতে—কিছু অন্যান্য সাহিত্যে'। —ডাঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত।

দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় আলবারগণ রাগমার্গে ভজনা করিতেন। তাঁহারা নিজদিগকে নায়িকা এবং বিষ্ণু বা কৃষ্ণকে নায়ক-রূপে কল্পনা করিয়া ভগবানের উপাসনা করিতেন। তাঁহাদের রচিত ভক্তিমূলক সঙ্গীতগুলিতে গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের প্রেমলীলার কথারও উল্লেখ আছে। এই আলবারগণ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে নবম শতকের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। কিন্তু

তাঁহাদের গানে গোপীদের কথার উল্লেখ থাকিলেও রাধার কথা পাওয়া যাইতেছে না।

পুরাণাদিতে কোন কোন স্থলে রাধা নামের উল্লেখ রহিয়াছে। পদ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রভৃতিতে রাধার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পুরাণের রচনাকাল সম্বন্ধে নিঃসংশয়রূপে কিছুই বলা যায় না। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে রচিত কৃষ্ণলীলার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবতে রাধা নামের কোন উল্লেখ নাই। ইহাতেই সন্দেহ হয় যে, উপরিউক্ত পুরাণগুলি ভাগবতের পূর্বে রচিত হইয়াছিল কি না। অনেকে অনুমান করেন যে, ভাগবতের দশম স্কন্ধে রাসলীলার বর্ণনায় যেখানে কৃষ্ণ রাসমণ্ডল হইতে তাঁহার একজন প্রিয়তমা গোপীকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন সেই প্রধানা গোপী এই রাধা। ইহা নিশ্চিত যে, রাধা নামটি ভাগবতকারের পরিচিত ছিল না। এই জন্যই যে-সকল পুরাণে রাধা নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে স্বভাবতই সন্দেহ জাগ্রত হয়।

প্রাচীন সাহিত্য প্রাকৃত গানের সঙ্কলন হালের 'গাথা-সপ্তশতী'-তে রাধার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গাথাগুলি কত প্রাচীন তৎসম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু স্থিরীকৃত না হইলেও এইগুলি যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল এই সম্বন্ধে সকলেই এক মত। কাজেই এইরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হইবে না যে, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কাহিনী খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তবে সন্দেহ থাকিয়া যায় সুপণ্ডিত ভাগবতকার কি এই গাথাগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না?

পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার বহু দৃশ্যের সহিত একটি দণ্ডায়মান যুগলমূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেই মনে

হয় যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বেই (পাহাড়পুরের মন্দির ঐ সময় নির্মিত হইয়াছিল) রাধাবাদের প্রচলন ছিল।

খৃষ্টীয় নবম শতকে আনন্দবর্ধন কর্তৃক রচিত 'ধ্বন্যালোক' নামক অলঙ্কার গ্রন্থে এবং খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক কুন্তকের 'বক্রোক্তি-জীবিত' নামক অলঙ্কার গ্রন্থেও উদ্ধৃত দু-একটি শ্লোকে রাধা নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। খৃষ্টীয় দশম শতকে সঙ্কলিত 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' নামক গ্রন্থে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লক্ষ্মণসেনের সুহৃৎ বটুদাসের পুত্র শ্রীধর দাস কর্তৃক সঙ্কলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামক গ্রন্থে কতকগুলি শ্লোকে রাধার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই দুইটি সঙ্কলন গ্রন্থেই অজ্ঞাতনামা কবিদের লিখিত শ্লোক স্থান পাইয়াছে। এই সকল শ্লোকে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার যে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে রাধাকৃষ্ণকে অলৌকিক জগতের দেবদেবী বলিয়া মনে হয় না। ঐ সময়ে কাব্যের নায়ক-নায়িকা হইবার মর্যাদা একমাত্র রাজা ও রাজকল্প ব্যক্তিদের ভাগ্যেই জুটিত। কিন্তু তাঁহাদের নামে যে-কোন প্রকার প্রেমলীলা চালাইয়া দেওয়ার অসুবিধা ছিল। অথচ কবি-কল্পনায় মানবিক প্রেমের কামনা বাসনার যে-রূপ ফুটিয়া উঠিত তাহা কি করিয়া প্রকাশ করা যায়? পুরাণে যে-সব দেবদেবীরা স্থান পাইয়াছেন তাঁহাদের সুনির্দিষ্ট রূপ মানুষের মনে তখন স্থায়ীভাবে আসন লাভ করিয়াছে। কিন্তু রাধা তখনও শুধু কল্পনায় রহিয়াছেন। কাজেই তাঁহাকে আশ্রয় করিতে কোন প্রতিবন্ধক নাই। ঐ সময়ের প্রকীর্ণ শ্লোকগুলিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী মানবিক প্রেমের স্থূল ভোগবাসনার কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কবি জয়দেব ও তাঁহার গীতগোবিন্দ

দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খণ্ড কবিতাতে রাধাকৃষ্ণলীলার কোন সংহত ও সামগ্রিক রূপ পরিলক্ষিত হয় না। জয়দেব সর্বপ্রথম এই কার্য সাধন করিলেন। জয়দেব রাধাকে নায়িকা ও কৃষ্ণকে নায়ক করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনা করিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা লক্ষ্মণসেনের সভায় উমাপতি ধর, গোবর্ধন আচার্য, ধোয়ী, শরণ এবং জয়দেব এই পাঁচজন বিখ্যাত কবির সম্মেলন হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে জয়দেব শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি শুধু বাঙ্গলাদেশরই শ্রেষ্ঠ কবি নন, ঐযুগে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাই গীতগোবিন্দের বিষয়বস্তু। এই কাব্যটি বারটি সর্গে বিভক্ত। চব্বিশটি গান বা পদ লইয়া এই সর্গগুলি গঠিত। 'মনে হয়, এই গানগুলি লইয়া প্রথমে যাত্রাপালার মত গীতিনাট্য রচিত হইয়াছিল। পরে সর্গবন্ধ 'মহাকাব্য'-এর রূপ দেওয়া হইয়াছে।'

রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার মধ্যে জয়দেব প্রথম অলৌকিকত্ব আরোপ করেন ইহাই অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু জয়দেবের কাব্যের বিষয়বস্তু আলোচনা করিলে এই মত গ্রহণ করা শক্ত হইয়া পড়ে। যদিও বৈকুণ্ঠনিবাসী শ্রীহরির প্রেমলীলার কথাই এই কাব্যের বিষয়বস্তু, তথাপি মানবিক কামনামূলক প্রেমকথাই যে, এই কাব্যে স্থান পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কিছুই থাকে না। মহাপ্রভু জয়দেব গোস্বামীর কাব্যের রস আস্বাদন করিতেন। মহাপ্রভু সাধারণ মানব ছিলেন না, তাই নিষ্কাম হইয়া তিনি এই কাব্যের রস আস্বাদন করিতে পারিয়াছিলেন। রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে যে-কোন কথাই তাঁহার মনে অলৌকিকত্বের আবেদন আনিয়া দিত। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে এই কাব্যের আধ্যাত্মিক তাৎপর্যটি হৃদয়ঙ্গম করা

বড় সহজ কথা নয়। মনে হয়, 'রাধা ও কৃষ্ণের কেলি ব্যতীত স্বর্গমর্তপাতালের অন্য কোনো বিষয়, কোনোরূপ ধর্মনৈতিক কিংবা নৈতিক মতামত ইত্যাদি কিছুই গীতগোবিন্দে স্থান লাভ করে নাই।' জয়দেবের কাব্যের বিষয়বস্তু অবগত হইলেই এই সত্য প্রতিভাত হয়। গীতগোবিন্দের বিষয়বস্তু মোটামুটি এই—

একদিন কৃষ্ণ গোপিনীগণ সমভিব্যাহারে যমুনাতীরে বসন্তবিহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাধা বেশভূষা করিয়া কৃষ্ণের উদ্দেশে তথায় আসিয়া উক্ত ব্যাপার দেখিয়া ক্রোধভরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণও একান্ত অপ্রতিভ হইয়া মৌনভাব ধারণ করিয়া রহিলেন এবং রাধাকে গমন হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টামাত্র করিতেও সাহসী হইলেন না। কিন্তু রাধা চলিয়া গেলেন দেখিয়া তিনি গোপবধূদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোনো-এক নিভৃত কুঞ্জবনে আশ্রয় লইয়া মনোদুঃখে রাধার কথা ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে রাধা স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণ-কৃত পূর্ববিহার স্মরণে উদ্দীপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে আনয়নার্থ তাঁহার নিকট সখী প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণ সখীকে বলিলেন, 'আমি যাইতে পারিব না, তাহাকে আসিতে বল'। তারপর সখীর রাধার নিকট প্রত্যাগমন এবং কৃষ্ণের প্রার্থনানুযায়ী রাধাকে কৃষ্ণের নিকট পাঠাইবার চেষ্টা। কিন্তু রাধা ইচ্ছা থাকিলেও বিরহজনিত শারীরিক ক্লান্তি হেতু স্থান পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। সখী অগত্যা আবার কৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। কৃষ্ণ এবার রাধার সকাশে স্বয়ং যাইতে রাজি, সখী ছুটিয়া আসিয়া রাধাকে সুসংবাদ জানাইলে রাধা বাসকসজ্জা হইয়া কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ কথা রাখিতে পারিলেন না। কাজেই রাধা ঠাওরাইলেন যে, কৃষ্ণ অন্য-কোনো রমণীর সাক্ষাৎ পাইয়া তাহার সহিত জমিয়া গিয়াছেন। উক্ত রমণীর সহিত কৃষ্ণ কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন, সেই সকল কথা

রাধা কল্পনায় অনুভব করিয়া সেই ভাগ্যবতীর তুলনায় নিজেকে অত্যন্ত হতভাগিনী মনে করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাত্রি এইরূপেই কাটিয়া গেল। প্রত্যুষে কৃষ্ণ অন্য রমণীর ভোগচিহ্ন সকল শরীরে ধারণ করিয়া রাধার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। রাধা কৃষ্ণকে কিরূপ ভাষায় সম্ভাষণ করিলেন তাহা বোধ হয় আর বলিবার আবশ্যক নাই। কৃষ্ণ নিজের দোষক্ষালনের কোনোরূপ চেষ্টা করিলেন না, কারণ সে চেষ্টা নিষ্ফল। অধরের কজ্জল, কপোলের সিন্দূর, বক্ষঃস্থ যাবকরঞ্জিত পদচিহ্ন—এসকল কোথা হইতে আসিল। তাহার না হয় একটি বাজে কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু পরিধানের নীল শাটী সম্বন্ধে তো আর কোনোরূপ মিথ্যা কৈফিয়ৎ খাটে না। রাধা কথা শেষ করিয়া দুর্জয় মান করিয়া বসিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের কাছে কি মান টিকে? তিনি মনোমত কথায় রাধার প্রীতিসাধন করিলেন, রাধা কৃষ্ণের উপরে যে-আড়ি করিয়াছিলেন তাহা ভাবে পরিণত হইল। এইতো গেল প্রভাত সময়ের ঘটনা। যোগে-যাগে দিনটিও কাটিয়া গেল। দিনান্তে অভিসারিকা রাধা কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন, উভয়ের মিলন হইল। মিলনান্তর সম্ভোগ, সম্ভোগান্তর কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার বেশবিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থের সমাপ্তি। —প্রমথ চৌধুরী।

জয়দেবের কাব্যে তৎকালীন রুচি প্রতিফলিত হইয়াছিল। বাৎস্যায়ণের কামসূত্র অবলম্বনে নায়ক-নায়িকার পরিকল্পনা ও লীলাবিহার তৎকালীন কাব্যের মুখ্য উপজীব্য ছিল। 'কাব্যে যত প্রকার রস আছে, তাহার মধ্যে শৃঙ্গার রসই মুখ্য। বিশ্বের সমস্ত কাব্যকবিতার মধ্যে এই শৃঙ্গার রস ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে। সার্বজনীন প্রীতির আস্বাদ বলিয়াই শৃঙ্গার রসের নাম মধুর রস। কিন্তু জয়দেব এই মধুর রসকে যে-ভাবে পরিবেশন কবিয়াছেন, তাঁহার পূর্বে অন্য কেহই সেরূপ পারেন নাই। বস্তুতঃ ভগবান্‌কে মূর্তিমান্ শৃঙ্গার

রসরূপে কল্পিত করিয়া তিনি যে-ভক্তিভাব ও সাহিত্যরসের মধ্যে এক স্বর্ণশৃঙ্খল নির্মাণ করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার। মনে রাখিতে হইবে যে, জয়দেবের কাব্য ধর্মগ্রন্থ নহে, অর্থাৎ মনুসংহিতাও নয়, ভগবদ্‌গীতাও নয়। গীতগোবিন্দ কাব্য; কাব্যরসই ইহার প্রধান সম্পদ; অথচ তাহার মধ্য দিয়া একটি স্বচ্ছন্দ অন্তঃসলিলপ্রবাহরূপে ভক্তিভাবের ফল্‌গুধারা তিনি কেমন করিয়া বহাইলেন, তাহা চিরদিন ভাবুকমনের বিস্ময়ের বস্তু হইয়া থাকিবে। তিনি যে "মঙ্গলসমুজ্জ্বলগীতি" গাহিয়া গিয়াছেন, সেই উজ্জ্বল রসই বৈষ্ণব কাব্য, বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব ধর্মের সার কথা হইয়া রহিয়াছে।

কাহারও কাহারও মতে জয়দেবের কাব্যে এই আদিরসাধিক্য শ্লীলতার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সমালোচনা নিছক রুচির উপর নির্ভর করিতেছে। কাব্যের নিয়ামক পরিবর্তনশীল রুচি নহে, খেয়াল নহে, অলঙ্কার শাস্ত্রের ধরাবাঁধা নিয়ম। কাজেই কাব্যের রসসৃষ্টির প্রয়োজনে, অলঙ্কার-শাস্ত্রের শাসনে জয়দেব যে চিত্রকাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা সাময়িক রুচির দ্বারা বিচার্য নহে। হিন্দু সাম্রাজ্যের অস্তগমনকালে শেষ অক্ষম নরপতির রাজসভার রুচি যদি বর্তমান বিংশ শতাব্দীর রুচির দ্বারা সমর্থিত না-ও হয় তাহা হইলেও জয়দেবের অনন্যসাধারণ সৃজনী প্রতিভার বিলাস ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না।' —খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

জয়দেবের কাব্যের শ্লীলতা অশ্লীলতা সম্পর্কে যাঁহার যে মতই থাকুক না কেন ইহার অপরিসীম কাব্যমূল্য অনস্বীকার্য। জয়দেবের 'মধুরকোমলকান্ত পদাবলী'-র ছন্দ, অলঙ্কার শুধু বাঙ্গলা সাহিত্যকে নয় তাবৎ নবীন ভারতীয় আর্য ভাষায় রচিত সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। 'পূর্বতন সংস্কৃত কাব্যের ভাষা, ভাব ও ছন্দ গ্রহণ করিলেও, প্রকৃতপক্ষে জয়দেব তাহাদিগকে নূতন প্রকারে ও ভঙ্গীতে প্রয়োগ

করিয়াছেন ; এবং তাহার সমস্ত কাব্যটিকে বাহির ও ভিতর হইতে যে নূতন ও বিচিত্র রূপ দিয়াছেন, তাহা পূর্ববর্তী সংস্কৃত কাব্যের সম্পূর্ণ অনুযায়ী নহে,—বরং সম-সাময়িক .বোদিত দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অধিকতর অনুরূপ।'

বাঙ্গলা সাহিত্যের জয়যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে গীতগোবিন্দকে আশ্রয় করিয়া। গীতিকবিতার প্রাণ বাঙ্গলা সাহিত্যে গীতগোবিন্দ হইতেই সঞ্চারিত হইয়াছে। 'পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দের আকর শ্রীগীতগোবিন্দ। "সরস মসৃণমপি মলয়জ পঙ্ক"—পয়ার, এবং "চন্দন চর্চ্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী" ও "রতিসুখসারে গতমভিসারে মদন মনোহর বেশম্" ত্রিপদীর সুন্দর উদাহরণ। এইরূপ অন্য ছন্দও আছে। অনুপ্রাস, যমক, উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার এবং পাদান্ত সুষ্ঠু মিলের প্রয়োগ কৌশলও গীতগোবিন্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে।' —হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

গুজরাটী, রাজস্থানী, হিন্দী, ওড়িয়া, আসামী প্রভৃতি নব-ভারতীয় আর্যভাষাগুলির উদ্ভব খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতকে হইয়াছিল। এই প্রত্যেকটি ভাষাতেই গীতগোবিন্দ অনূদিত হয় এবং বাঙ্গলা সাহিত্যে গীতগোবিন্দের যে-প্রভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে প্রত্যেকটি নবোদিত দেশীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের উপর ঐ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বড়ু চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

চর্যাপদে যে-ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে সেই প্রাচীন ভাষার দিক দিয়া বিবেচনা করিলে চর্যাপদের পরই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাম করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা হইতেছেন বড়ু চণ্ডীদাস। এই কবি

এবং তাঁহার রচিত কাব্যের জন্মবৃত্তান্ত কিছুই ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই। দশম—দ্বাদশ শতাব্দীতে চর্যাপদগুলি রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যেই জয়দেবের গীতগোবিন্দ রচিত হইয়াছিল। ঠিক ঐ সময়েই অর্থাৎ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাঙ্গলা দেশে তুর্কি আক্রমণ আরম্ভ হয়। তুর্কি জাতির ধর্মান্ধতা ও অত্যাচার-প্রবণতা বাঙ্গলা দেশের উপর দিয়া এক প্রচণ্ড ঝড় প্রবাহিত করাইয়া দিল। এই অত্যাচারী বিদেশী জাতি বাঙ্গালীর বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র প্রধান বৌদ্ধ-বিহারগুলি এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যুষিত গ্রামগুলি একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিল। ফলে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ এই দুই শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন মিলে না। একেবারে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আসিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় পাইতেছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও ঐ সময়কার বাঙ্গালীর সাহিত্যকীর্তি বলিয়া অনুমিত হয়। রামায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ভাষা কবি ও নকলনবীশদের হাতে পড়িয়া এত রূপান্তরিত হইয়াছে যে, তাহাদের আদি বা প্রাচীন রূপটি আর খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। সেইদিক দিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চর্যাপদের পরই প্রাচীনত্বের দাবী করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিশেষ কোন প্রচার না থাকায় ইহার ভাষা অবিকৃত রহিয়া গিয়াছে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে বাঙ্গলা ভাষার কি রূপ ছিল তাহা এই গ্রন্থ হইতে আমরা ধারণা করিতে পারি। চর্যাপদের ভাষা সবে প্রাকৃতের খোলস ছাড়িতেছে। অতঃপর দুইশত বৎসরের বিরাট শূন্যতার যুগ পার হইয়া আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে পাইতেছি। ভাষার প্রাচীনত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে চর্যাপদের পরই নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাম করিতে হয়। চর্যাপদে বৌদ্ধপ্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু দুইশত বৎসর পর যখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

পাইলাম তখন দেখিতেছি যে, বাঙ্গলা সাহিত্যে বৌদ্ধপ্রভাব সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে এবং সংস্কৃত ও পৌরাণিক প্রভাব (ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংস্কৃতি) প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত-প্রভাবিত বাঙ্গলা ভাষার প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন হইতেছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাঙ্গলা সাহিত্যে এক প্রবল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিখানি ১৩১৬ বঙ্গাব্দে আবিষ্কৃত হয়। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বাঁকুড়া জেলার এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের গোয়াল ঘরের মাচা হইতে পুথিখানি উদ্ধার করেন। পুথিটি পাঠ করিয়া জানা গেল যে, এইটি একটি অজ্ঞাতপূর্ব কৃষ্ণলীলাত্মক কাব্য। ইহার রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। পুথিটি অখণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। ইহার গোড়ার একখানি এবং মধ্যের ও শেষের কয়েকখানি পাতা নাই। ফলে এই কাব্যের নাম, রচনাকাল এবং পুথি লেখার তারিখ কিছুই বুঝিবার উপায় রহিল না। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম দিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক পুথিটি প্রকাশিত হইল। পুথিখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত ও সাহিত্য-রসিক সমাজে প্রবল সাড়া পড়িয়া গেল। চর্যাপদের পর এত প্রাচীন ভাষা আর কোন বাঙ্গলা কাব্যে ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। কাব্যের কাহিনীতে ও রচনারীতিতেও বেশ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি সমস্যাও দেখা দিল। 'চণ্ডীদাস' ভণিতায় এতাবৎ-কাল যে-সকল পদ পড়িয়া বাঙ্গালী মুগ্ধ হইয়াছে সেই চণ্ডীদাস এবং বড়ু চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি কিনা ইহাই হইল সমস্যা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কবির বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। শুধু কোন কোন পদের শেষে কবি 'বড়ু চণ্ডীদাস' এই ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন, আরও জানা যায় যে, তিনি দেবী বাসলীর সেবক ছিলেন। 'চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ-কথা ও গালগল্পে প্রচলিত আছে। এক প্রবাদ

অনুসারে ইঁহার জন্মস্থান ছিল বীরভূমের অন্তর্গত নান্নুর গ্রাম। আর এক প্রবাদের মতে ইনি ছিলেন বাঁকুড়ার নিকটবর্তী ছাতনা গ্রামের অধিবাসী। প্রবাদে আরও বলে যে, ইঁহার এক রজক জাতীয়া সাধনসঙ্গিনী ছিলেন। এই মহিলার নাম সম্বন্ধেও বিভিন্ন প্রবাদের মধ্যে মিল নাই—এক মতে ইঁহার নাম ছিল তারা, অপর মতে রামতারা এবং তৃতীয় মতে রামী। এই সব জনশ্রুতি আংশিকভাবেও সত্য কিনা, তাহা যাচাইয়া লইবার মত কোন উপাদান এযাবৎ পাওয়া যায় নাই।'—ডাঃ স্কুমার সেন।

চণ্ডীদাস সম্পর্কে সমস্যার স্বরূপটি হইতেছে—

(ক) চণ্ডীদাসের নামে যে-পদগুলি প্রচলিত আছে সেই চণ্ডীদাস এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি কিনা?

(খ) যদি একই চণ্ডীদাস প্রচলিত পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করিয়া থাকেন তবে তিনি কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন?

(গ) আর যদি এক চণ্ডীদাস না হইয়া একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় তবে তাঁহারাই বা কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন?

এই সমস্যা সম্পর্কে পণ্ডিত ব্যক্তিরা একমত হইতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট আদিরসপ্রধান স্থূল রুচির কাব্য। কিন্তু পদাবলীর চণ্ডীদাসের পদসমূহ উচ্চশ্রেণীর কবিতা। এইদিক দিয়া দেখিলে দুই চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, যৌবনে যে-চণ্ডীদাস অশ্লীল রুচির পরিচয় দিয়াছেন তিনিই পরিণত বয়সে অলৌকিক রসাশ্রিত কাব্যপ্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি পদকে পদাবলীর চণ্ডীদাসের ভাষায় রূপান্তরিত করিলে দুইটি পদ একই হইয়া যায়। পদটি পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল :—

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহি আরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিয়াঁ কদম তলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥
এ মোর নিষ্ফল জীবন এ বড়ায়ি ল।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে॥
লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলিআঁ তবেঁ বচনে
আড়বাঁশী বাএ মধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী না দিলোঁ মো আনুমতী
দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে॥
তিঅজ পহর নিশী মোঞঁ কাহ্নাঞিঁর কোলে বসী
নেহালিলেঁ। তাহার বদনে।
ঈষত বদন করী মন মোর নিল হরী
বে আকুলী ভরিলোঁ মদনে॥
চউঠ পহরে কাহ্ন করিল অধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মারে নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

এই পদটিই পদাবলীর চণ্ডীদাসের নামে এইভাবে প্রচলিত আছে—

প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিয়া কদম্ব তলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে॥

অঙ্গে দিয়া চন্দ বলে মধুর বচন
আয় বায় বাঁশী সুমধুরে।
চাহিলেন সুরতি নাহি দিল পাপমতি
দেখিল কৃষ্ণ দোজি প্রহরে ॥
তৃতীয় প্রহর নিশি মুই কৃষ্ণ কোলে বসি
নেহারিনু সে চাঁদ বদনে।
ঈষৎ হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি
বিয়াকুল হইল মদনে ॥
চতুর্থ প্রহরে কান করিল অধর পান
মোর ভেল রতি আশোয়াসে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঙ্গিল আমার নিঁদে
রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে যে, একজন চণ্ডীদাস বর্ত্তমান ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখা যায় যে—

বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত ॥

কিন্তু প্রশ্ন উঠে যে, মহাপ্রভু কি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রস আস্বাদন করিতেন? শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নায়ক কৃষ্ণ দম্ভ করিয়া নিজের ঐশ্বর্যের কথা বারেবারেই ঘোষণা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মতে ইহা গুরুতর রসাভাস। পদাবলীর চণ্ডীদাসের পদগুলিতে 'রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত' চৈতন্যদেবের মূর্তিটিই আমাদের নয়নসম্মুখে প্রতিভাত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাহার কোন আভাষই নাই। কাজেই উভয় চণ্ডীদাস একব্যক্তি ছিলেন তাহা মানিয়া লইতে অসুবিধা হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নির্লজ্জ কামুকতা এবং অসংযত ইন্দ্রিয়ভোগাসক্তির যে-চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে কবিকে অশিক্ষিত ও গ্রাম্য রুচির মানুষ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিভিন্ন পুরাণ ও গীতগোবিন্দের প্রভাব এত বেশী এবং এই কাব্যে যে-সব সংস্কৃত শ্লোক দেওয়া হইয়াছে তাহাতে কবিকে কিছুতেই অশিক্ষিত বলিয়া ভাবা চলে না। তাই অনেকে মনে করেন যে, ঐ সময়ে যাত্রা-জাতীয় যে-অশ্লীল রুচির কৃষ্ণধামালী নামক লোকরঞ্জক সঙ্গীত প্রচলিত ছিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তাহা ছাড়া আর কিছু নয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দকেও তাঁহারা ঐ পর্যায়ভুক্ত করিয়া থাকেন। পদাবলীর চণ্ডীদাসের যে-কামগন্ধহীনতায় আমরা মুগ্ধ হই তিনি কৃষ্ণধামালী রচনা করিয়াছিলেন ইহাও মানা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপি ও ভাষা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যেই এই কাব্য রচিত হইয়াছিল। ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছু না থাকিলেও পদাবলীর চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি কিনা সেই সমস্যার সমাধান ইহাতেও মিটিল না।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন এই সমস্যার একটি সমাধান করিয়াছেন। তাঁহার মতে, চণ্ডীদাসকে 'আমরা এ পর্যন্ত যাহা মনে করিয়া আসিয়াছিলাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সেই ধারণা কতকটা ক্ষুন্ন হইবার কথা। তিনি প্রেমের যে-উচ্চগ্রামে সুর বাঁধিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যে তাহার অনেক নিম্নে। এ পাড়াগেঁয়ে কৃষক কবির অকপট লালসার কথায় সে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য কোথায়? চণ্ডীদাস বলিতে আমরা যে-পবিত্রতা ও যূথিকাশুভ্র নির্মলতা বুঝি, এখানে তাহা নাই। এ যে, একান্ত স্থূল, একান্ত বিসদৃশ চিত্রপট, আঁধারে ছিল ভাল, চণ্ডীদাসকে যে, এই

কীর্তন হেয়, অশ্রদ্ধেয় করিয়া দিল ; তাঁহার পদাবলীর সঙ্গে এক পংক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাখা যায় না। তাহা হইলে যে, ব্রহ্মচণ্ডাল যোগ হয়।' দীনেশচন্দ্র অতঃপর বলিয়াছেন যে, এই ভোগাসক্তির কবিই রামী ধোবানীর প্রেমে অলৌকিক স্বর্গীয় প্রেমের রসাস্বাদ পাইলেন এবং পদাবলীর মধুর পদগুলি অতঃপর রচিত হয়। 'যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন না পাইতাম, তবে বুঝিতাম না গীতগোবিন্দ ও কৃষ্ণধামালীর পরেই হঠাৎ চণ্ডীদাসের অভ্যুদয় কি করিয়া হইয়াছিল। চণ্ডীদাসকে এখন আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মহিমায় বুঝিতে পারিতেছি। ধরাতল হইতে উত্থিত হইয়া তিনি কিরূপে পৃথিবীর উপরে উঠিয়াছিলেন, তাঁহার মস্তক কিরূপে গৌরবের তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল—তাহা এখন পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেছি।' কিন্তু এই অভিমত পণ্ডিতমহল মানিয়া লইতে পারেন নাই। ফলে চণ্ডীদাস সমস্যাটি এখনও সমস্যাই রহিয়া গিয়াছে। সে যাই হোক, সমস্যা যাহাই থাকুক না কেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যমূল্য অনস্বীকার্য। কাব্যের সন-তারিখের চেয়েও কাব্যরস আস্বাদন পাঠকের পক্ষে অধিকতর কাম্য। এই কাব্যরস আস্বাদন করিবার পূর্বে আমরা কাব্যটির কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

কাব্য-বিশ্লেষণ—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি তেরো খণ্ডে বিভক্ত—(১) জন্মখণ্ড (২) তাম্বুলখণ্ড (৩) দানখণ্ড (৪) নৌকাখণ্ড (৫) ভারখণ্ড (৬) ছত্রখণ্ড (৭) বৃন্দাবনখণ্ড (৮) কালীয়দমনখণ্ড (৯) যমুনাখণ্ড (১০) হারখণ্ড (১১) বাণখণ্ড (১২) বংশীখণ্ড (১৩) বিরহখণ্ড। কাহিনীটি হইতেছে—

কংস ইত্যাদি অত্যাচারী পাষণ্ডদের দমন করিবার জন্য এবং ভূভার হরণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ মর্তে দৈবকীর উদরে জন্মগ্রহণ করিলেন। দেবী লক্ষ্মীও গোকুলে সাগর গোয়ালার ঘরে রাধারূপে জন্ম নিলেন। রাধার রূপ অসামান্য—

তীনভুবনজনমোহিনী।
রতিরসকামদোহনী॥
শিরীষকুসুমকোঁঅলী।
অদ্ভুত কনক পুতলী।

কৃষ্ণ রাধার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তিনি রাধার মায়ের পিসী বড়াই (বড়ায়ি) বুড়ীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বুড়ী রাজী হইল। কৃষ্ণ তাহার মারফৎ রাধাকে তাম্বুল পাঠাইলেন। বুড়ী গিয়া রাধাকে এই কু-প্রস্তাব জ্ঞাত করাইল। তাঁহার কামোদ্দীপনার জন্য বলিল—

নিশিত সপন দেখিল জগন্নাথ।
শুন চন্দ্রাবলী তোর বুকে দিল হাথ॥
কনকপদ্মকোরক সম দুই তনে।
পরসি বিকল ভৈল দুসহ মদনে॥

রাধা ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বলিলেন—

তোঁ মোর বড়ায়ি মোঁ তোর নাতিনী।
এবেঁসি তোহ্মার মুখে শুনী হেন বাণী॥
এহা বুলী বড়ায়িক চড়ে মাইল রোষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥

বুড়ী রাগে জ্বলিতে লাগিল। সে সাশ্রুনেত্রে গিয়া কানাইয়ের কাছে তাহার এই দুর্গতির কথা জানাইল—

কোপেঁ কভোঁ মোকে হাথেঁ না ছুইল সামী।
গালিহো সাসুড়ী স্থানে না পাইল আহ্মী॥
তোহ্মার কারণে কাহ্নাঞি এতেক বএসে।
বড় অপমান পাইলোঁ এবেঁ খাইবোঁ বিসে॥

কৃষ্ণ ঠিক করিলেন রাধা যখন মথুরাতে ক্ষীর, ছানা বিক্রয় করিতে যাইবে তখন দানী সাজিয়া (পারঘাটে শুল্ক আদায়কারী) রাধাকে জব্দ করিবেন। বড়াই বুড়ীর অভিভাবকত্বে রাধা মথুরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণ পারঘাটে বসিয়া রহিয়াছেন। রাধাকে দেখিতে পাইয়াই তিনি বলিলেন—

আহ্মা ছাড়ি জাইবি কোণ পথে।
আজি পড়িলা মোর হাথে॥

রাধা ভীত হইয়া বড়াইকে বলিলেন—আমি এগার বৎসরের বালিকা। বারো বছর না হইলে দেহদান করা যায় না।

অথচ, 'কাহ্ন মোকে মাঙ্গে আলিঙ্গনে'। সে আমাকে—

পরিহাস করে দানছলে।
কাঞ্চুলী ভাঁগিতে চাহে বলে॥

রাধা অতঃপর কৃষ্ণকে অনেক বুঝাইলেন, কখনও বা ক্রুদ্ধ হইলেন, কখনও বা অভিশাপ দিলেন। সতীত্বই নারীর প্রধান ধর্ম, তাহা রাধা কিছুতেই পরিত্যাগ করিবেন না। তিনি দস্তরমত কোমর বাঁধিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে ঝগড়া করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—

বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝী।
মোর রূপ যৌবন তোহ্মাতে কী॥
দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে।
আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে॥

সতীত্ব সম্পর্কে রাধা অত্যন্ত সচেতন—

সেসি নারী যে হএ সতী।
যাক উপভোগে নিজ পতী॥

রাধা কৃষ্ণকে রাজা কংসের এবং তাঁহার স্বামী আইহনের ভয় দেখাইলেন, কিন্তু কৃষ্ণ নাছোড়বান্দা। কারণ 'তার বিরহে চিত্ত বেআকুল'। অতঃপর কৃষ্ণ রাধাকে বুঝাইলেন—

এ রূপ যৌবন সব থীর নহে
মনে ভাব গো-আলী।
রতি উপভোগে সফল কর
পরিতোষ বনমালী॥

রাধা কৃষ্ণকে তদুত্তরে বলিলেন যে, তিনি কৃষ্ণের মাতুলানী। মাতুলানীর সঙ্গে এরূপ ব্যবহার মহাপাপ। কৃষ্ণ ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—

নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী।
রঙ্গে ধামালী বোলে দেব বনমালী॥

কৃষ্ণ রাধাকে আরও বুঝাইলেন—

আম্বু জাম্বু মুকুলিল ভরে নোআঁইল ডাল।
নহুলী যৌবন রাখিবি কত কাল॥
তোহ্মার যৌবন রাধে পাণির ফোটা।
চিরকাল না রহিবে থাকি জাইবে খোঁটা॥

কৃষ্ণ রাধার মন ভিজাইবার জন্য স্তুতি করিতে লাগিলেন—

তোহ্মে গাঙ্গ বারাণসী সরুপেঁসি জান।
তোহ্মে মোর সব তীথ তোহ্মে পুণ্যস্থান॥

সেই সঙ্গে বল প্রয়োগের ভয়ও দেখান হইতে লাগিল। রাধা তখন নিজের রূপ-যৌবন ও অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। বোধ হয় অন্য জনমে তিনি কোন পাপ করিয়াছিলেন তাই আজ তাঁহার এই দুর্দশা।—

অনন্ত জরমেঁ গুরু ব্রাহ্মণেরেঁ
দিলোঁ নানা দুখভারে।
তেকারণে বিধি যত দুখগণ
লেখিল সাঠীহারে॥

রাধা কাঁদিতে লাগিলেন—

ঘরত বাহির নহোঁ বড়ায়ি গো
স্বামীর বড়ই দুলালী।
নির্দ্দয় কাহ্নাঞির হাথে পড়িলোঁ।
মোএঁ আবালী গো-আলী॥

রাধা আরও বলিলেন—

ধিক জাউ নারীর যৌবনে।
মোর দুঈ আঁখি ধারা শ্রাবণে।
কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী :
আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী॥

রাধা স্থির করিলেন—

আর না পিন্ধিবোঁ বড়ায়ি সুরঙ্গ পাটোল।
এহা দেখি মাঁগে কাহ্নাঞি বিরহের কোল॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি সিথের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচূর॥
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি সাতেসরী হার।
যা দেখিআঁ মাঙ্গে কাহ্নাঞি নিবিড় শৃঙ্গার

রাধা কৃষ্ণকে লোভ দেখাইলেন—

প্রথম যৌবন মোর মুদিত ভাণ্ডার।
হৃদয়ে কাঞ্চুলী গজ-মুকুতার হার॥
এহা আভরণ কাহ্নাঞি সব মোর নে।
বেরি এক কাহ্নাঞি মোক ঘর জাইতেঁ দে॥

রাধা অন্তিম মিনতি জানাইলেন—

যবেঁ কাহ্নাঞি করিবেক বলে।
ঝাঁপ দিবোঁ যমুনার জলে॥

কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। রাধা কাঁদিতে লাগিলেন এবং বড়াই বুড়ীকে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতে আবেদন জানাইলেন। বড়াই ফোঁকলা মুখে হাসিতে থাকিল। রাধা উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজী হইল।

তবেঁসি জানিল আহ্মে দৈবের ঘটন।
আহ্মা না ছাড়িব কভোঁ নান্দের নন্দন।

কিন্তু অনুরোধ জানাইল—

আতিশয় না চাপিহ অধর দাঁতে।
সখি সব দেখিআঁ বুলিব দন্তঘাতে॥
নখঘাত না দিহ মোর পয়োভারে।
আইহন দেখিলেঁ মোর নাহিঁক নিস্তারে।

অতঃপর সুরতক্রিয়া আরম্ভ হইল। রাধার অনুরোধ বিস্মৃত হইয়া কৃষ্ণ মত্তহস্তীর ন্যায় কমলবন মথিত করিলেন। শুধু তাই নয় রাধার গহনাপত্রও সব লুটিয়া নিলেন। বাড়ীতে গিয়া কি বলিবে রাধার হইল এই চিন্তা—

প্রথমে কাঢ়িআঁ লৈল সাতে সরী হার।
কানের কুণ্ডল নিল মুকুট মাথার॥
সব আভরণ মোর কাঢ়ি নিলেঁ বলে।
বুধি বোল এবেঁ ঘর জায়িব কোন ছলে॥

রাধার এই অবস্থা দেখিয়া—

রাধাক দেখিআঁ বড়ায়ি মনে মনে হাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥

অতঃপর নৌকাখণ্ড। কৃষ্ণ কাণ্ডারী সাজিয়া মথুরাযাত্রিণী গোপীগণকে যমুনা পার করাইলেন। রাধাকে একলা পার করিবার সময় নৌকা ডুবাইয়া তাঁহার উপর নানাবিধ অত্যাচার করিলেন। ভারখণ্ডে

কৃষ্ণ রাধার দধি দুগ্ধের পসরা বহন করিলেন। ছত্রখণ্ডে রাধার মাথায় ছাতা ধরিলেন। কিন্তু রাধার প্রতি প্রেমবশতঃ তিনি এরূপ করিলেন না। 'রাধা সঙ্গে জাএ বাটে বাটে। রতি আশেঁ না ছাড়এ পাশে।' বৃন্দাবন খণ্ডে কৃষ্ণের বনবিলাস ও রাসলীলা। আবারও রাধার উপর অত্যাচার। যমুনা খণ্ডে কালীয় নাগকে দমন করিবার জন্য কৃষ্ণের যমুনার জলে ঝাঁপ দেওয়া। রাধা বিচলিত হইলেন এবং এই সর্বপ্রথম কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ পাইল। হারখণ্ডে রাধা তাঁহার হার কৃষ্ণ চুরি করিয়াছেন বলিয়া যশোদার কাছে বিচার প্রার্থী হইলেন। বাণখণ্ডে কৃষ্ণ মদন বাণে রাধাকে কামাতুরা করিয়া ভুলিতে লাগিলেন।

রাধার মনে এইবার কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ জন্মিল। কিন্তু এই অনুরাগ কামোদ্দীপনা চরিতার্থ করিবার বাসনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কৃষ্ণ গোঁয়ারের মত রাধাকে যখনই পাইয়াছেন তখনই উপভোগ করিয়াছেন। রাধা সর্বদাই প্রবল বাধা দিতেন কিন্তু আস্তে আস্তে এই বালিকার দেহে ও মনে কামের জোয়ার আসিল। কৃষ্ণের তখন কার্য সিদ্ধি হইয়া গিয়াছে। রাধাকে তখন আর তাঁহার প্রয়োজন নাই।

বংশীখণ্ডে কৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়া রাধার আকুলতা।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥

কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত করাইয়া দিবার জন্য রাধা বড়াইকে অনুরোধ করেন। বড়াই আমল দেয় না। রাধা নিশীথে অভিসার করেন কিন্তু কৃষ্ণ আসেন না।

কাব্যের শেষখণ্ডে রাধা-বিরহ। রাধা আর সহ্য করিতে পারেন না। তিনি বড়াইকে বলেন—

মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনীরূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর॥
বাঘ ভালুকে বা আ াক খাউ।
কাহ্নাঞির উদ্দেশ্যে পরাণ জাউ॥
যবেঁ ডুবিআঁ মরোঁ যমুনা তরঙ্গে।
তবেঁ লয়িবোঁ গিআঁ কাহ্নের সঙ্গে॥

কৃষ্ণ এখন সাধু সাজিয়াছেন। তিনি বলেন যে, রাধা তাঁহার মাতুলানী কাজেই তিনি আর তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবেন না। প্রতিহিংসার কথাও কৃষ্ণ ভুলিতে পারেন না। রাধা তাঁহার তাম্বুল ফেরৎ দিয়াছিল, দূতীকে মারিয়াছিল, ভার বহাইয়াছিল, ছাতা ধরাইয়াছিল কাজেই ঐ রকম নায়িকাকে তিনি চাহেন না। তাহা ছাড়া তাঁহাকে কংস নিধন করবার জন্যে মথুরায় যাইতে হইবে। ঐ সব ছ্যাবলামি করিবার সময় তাঁহার নাই। রাধার ক্ষমা প্রার্থনায় ও কাতরতায় কৃষ্ণের ক্ষণিক দয়া হইল। তিনি বসিলেন, রাধা তাঁহার উরুতে মাথা রাখিয়া শুইলেন। রাধা ঘুমাইয়া পড়িতেই কৃষ্ণ পলাইয়া মথুরায় চলিয়া গেলেন। জাগিয়া উঠিয়া রাধা হাহাকার করিতে লাগিলেন। এইখানেই কাব্যের শেষ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আধ্যাত্মিকতা—অনেকের ধারণা যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনী বিবৃত হইয়াছে এইজন্য ইহাতেও আধ্যাত্মিকতা রহিয়াছে। তাঁহাদের মতে ভগবান যাহাকে অনুগ্রহ করিবেন বলিয়া স্থির করেন তাহার উপর জোর করিয়াই অনুগ্রহ চাপাইয়া দেন। তখন সেই ব্যক্তির ভগবান সম্পর্কে চেতনা আসে এবং তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য তাহার মধ্যে আকুলতা দেখা দেয়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই ব্যাখ্যা শুধু তাঁহারাই করিতে পারেন যাঁহারা 'ক' দেখিলেই কৃষ্ণ ভাবেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পুরাণ ও গীতগোবিন্দের প্রভাব—শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের রচয়িতা যে, সুপণ্ডিত ছিলেন তাহা এই কাব্যে প্রচুর সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার হইতেই বোঝা যায়। তিনি যে, পুরাণাদি সযত্নে পাঠ করিয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ এই কাব্যেই ছড়াইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ পুরাণ ও জয়দেবের গীতগোবিন্দকে অবলম্বন করিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'জন্মখণ্ড'-এ অত্যাচারী কংসের নিধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাহিনী যে-ভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ই পুরাণান্তর্গত কাহিনীর দ্বারা প্রভাবান্বিত। এই কাহিনী ভাগবত পুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণে রহিয়াছে। 'বৃন্দাবন খণ্ড', 'কালীয়দমন খণ্ড' ও 'যমুনা খণ্ড'-এর বর্ণনাতেও ভাগবত পুরাণের প্রভাব লক্ষণীয়। যমুনাখণ্ডে কৃষ্ণ কর্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণ পৌরাণিক ঘটনা। 'দানখণ্ড' ও 'নৌকাখণ্ড' কবির মৌলিক সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পুরাণের প্রভাব থাকিলেও কবি পুরাণান্তর্গত ঘটনাকে তাঁহার কল্পনার রঙে রঙীন করিয়া তুলিয়াছেন

গীতগোবিন্দ হইতে কবি বহু অলঙ্কার আহরণ করিয়া তাঁহার কাব্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। গীতগোবিন্দের অনেকগুলি শ্লোককে তিনি হুবহু ভাষান্তরিত করিয়াছেন। যেমন—

গীতগোবিন্দ—রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমন বিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—তোর রতি আশোআশে গেলা অভিসারে।
সকল শরীর বেশ করি মনোহরে॥
না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে।
তোহ্মার সঙ্কেত বেণু বাজএ যতনে॥

গীতগোবিন্দ—স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্
রাধিকা তব বিরহে কেশব।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—তনের উপর হারে।
মানএ যেহেন ভারে
অতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে ॥

গীতগোবিন্দ—বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—যদি কিছু বোল বোলসি তবে দশনরুচি তোহ্মারে।
হরে ডুরুবার ভয় আন্ধকার সুন্দরি রাধা আহ্মারে ॥

পুরাণ ও গীতগোবিন্দই শুধু নয় বিদ্যাপতির অনেক পদের সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেক পদের মিল দেখা যাইতেছে।

কাব্যমূল্য—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিষয়বস্তু বর্ণনায় কবি নিঃসন্দেহে গ্রাম্য রুচি ও স্থূলত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বালিকা রাধার রূপ ও দেহ সম্পদ দেখিয়া কৃষ্ণ মুগ্ধ হইলেন এবং এই তনুদেহখানিকে উপভোগ করিবার জন্য তাঁহার মনে দারুণ আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। কিন্তু সতীত্ব ধর্মে গভীর বিশ্বাসী রাধা তাঁহাকে পাত্তা দিলেন না। কৃষ্ণ যখন কোনভাবেই রাধাকে কাবু করিতে পারিলেন না তখন তাঁহার উপর বলপ্রয়োগ করিলেন। আস্তে আস্তে রাধার দেহ ও মনে কামের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কৃষ্ণের কিন্তু তখন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি রাধাকে নির্মম প্রত্যাখ্যানের দ্বারা প্রথম যে, রাধা রাজী হয় নাই, তাঁহার দূতীর গালে চড় মারিয়াছিল, তাঁহাকে দিয়া ভার বহাইয়াছিল সেই অপমানের প্রতিশোধ লইলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ মোটেই প্রেমিক নহেন। তিনি প্রতিহিংসা পরায়ণ, গোঁয়ার প্রকৃতির কামার্ত যুবক মাত্র।

চণ্ডীদাস সমাজ জীবন হইতেই এই স্থূল প্রেমকাহিনীর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'এদেশে বালিকার সহিত চিরদিন যুবকের বিবাহ হইয়া থাকে। বালিকার হৃদয়ে কন্দর্প-ভাব জাগাইয়া তুলিবার ভার স্বামীই গ্রহণ করে—বালিকাবধূর তনুমনোমন্থনেই তাহাকে প্রেম সুধার উদ্ধার করিতে হয়—কঠোর পীড়নে তাহার জীবন-অরণিতে লালসার বহ্নিকে জাগাইতে হয়। কিছুদিন ধরিয়া বালিকার জীবনে দারুণ পরীক্ষা চলিতে থাকে—বালিকার বর্ষীয়সী আত্মীয়ারা বড়ায়ির মতই সহায়তা করে, আর অন্তরালে দাঁড়াইয়া হাসে। কোন পক্ষ হইতেই দয়ামায়ার কথাই নাই। তারপর কি হয় তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে এই পর্যন্ত বলা যায়—অনেক ক্ষেত্রেই রাধার জীবনের মত ট্রাজেডীও ঘটে। বঙ্গের ঘরে ঘরে বিবাহিত জীবনে যাহা ঘটিত—কবি তাহাই রাধাশ্যামের মারফতে অত্যন্ত স্থূলভাবেই এই গ্রন্থে দেখাইয়াছেন।'—কালিদাস রায়।

এই কাব্যে স্থূলতা, গ্রাম্যরুচি ইত্যাদির ছড়াছড়ি থাকিলেও ইহাতে কবিত্বের অভাব নাই। রাধাচরিত্র অঙ্কনে কবি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। একগুঁয়ে, জেদী ও কলহপরায়ণা এক গ্রাম্যবালিকার অন্তরে আস্তে আস্তে প্রেমের বিকাশ ঘটাইয়া তাহাকে পরিণামে যে-ভাবে বিরহকাতরা ভাবময়ী নায়িকায় পরিণত করা হইয়াছে, তাহাতে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। রাধার রূপ দেখিয়া কৃষ্ণের উন্মত্ত হওয়া, রাধাকে লাভ করিবার জন্য বড়ায়ির সঙ্গে কৃষ্ণের ষড়যন্ত্র, রাধা ও কৃষ্ণের তীক্ষ্ণ বাক্যালাপ, রাধাকে কৃষ্ণের উপভোগ ও পরিণামে ত্যাগ—সমস্ত উপাখ্যানটি কবি প্রতিভার বলে নাটকীয় গুণসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত কাব্যখানিতে লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনবোধের সঙ্গে কল্পনাশক্তির সংমিশ্রণ ঘটিবার ফলে ইহা অপূর্ব সরসতা প্রাপ্ত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী নবোদিত বাঙ্গলা

ভাষায় প্রথম একটা সামগ্রিকরূপে এই কাব্যে দেখা গেল। গ্রন্থের পরিশেষে রাধার বিরহ-আকুলতা এত মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে যে, আমরা তখন ইতিপূর্বে বর্ণিত কাব্যের স্থূলতা ও অশ্লীলতা ভুলিয়া যাই। তখন মনে হয়, 'কালিন্দী নদীর কূলে, গোকুলের গোঠে, অবিরত যে-বংশীধ্বনি হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাহা গোলোক অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড়ু চণ্ডীদাস বাঙ্গালী জাতিকে তার দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনাইয়া গিয়াছেন; সেই বাঁশীর স্বরের নিকটে সকল তত্ত্বকথা ও শাস্ত্রকথা মিলাইয়া যায়।'

বিদ্যাপতি—প্রাক্-চৈতন্য যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। বিদ্যাপতি মিথিলার (বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলা অঞ্চল) রাজসভার কবি ছিলেন। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার জীবন প্রসারিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ব্রজবুলিতে পদাবলী রচনা করা ছাড়াও তিনি 'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা' নামে দুইখানি ঐতিহাসিক যুদ্ধবিগ্রহমূলক কাব্য, 'পুরুষপরীক্ষা' নামে একখানি আখ্যানগ্রন্থ, স্মৃতি ও পুরাণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ এবং শিব, দুর্গা ও গঙ্গাস্তুতি-বিষয়ক কিছু গ্রন্থ সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। তিনি পুরাপুরি বৈষ্ণব ছিলেন না। বৈষ্ণব ও শাক্ত সকল দেবদেবীই তাঁহার উপাস্য ছিল। বিদ্যাপতির প্রতিভা এত বিচিত্র ও বহুমুখী ছিল যাহা ঐ যুগের পক্ষে অকল্পনীয়।

রাধাকৃষ্ণবিষয়ক বিদ্যাপতির পদাবলীর অনুসরণেই পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ বৈষ্ণব কবিতার শ্রেণীবিভাগ করেন। ঐ যুগে মিথিলা ও বঙ্গদেশ একই সাংস্কৃতিক সূত্রে আবদ্ধ ছিল। বাঙ্গলাদেশ হইতে বহু ছাত্র মিথিলায় সংস্কৃত শিক্ষার জন্য যাইত। তাহারা ব্রজবুলিতে রচিত বিদ্যাপতির পদ বাঙ্গলাদেশে নিয়া আসিত এবং এইভাবেই বাঙ্গলাদেশে ব্রজবুলিতে পদ রচনার সূত্রপাত হয়। পদাবলী

সাহিত্যের আদি রচয়িতারূপে বাঙ্গলা কাব্যে বিদ্যাপতির স্থান নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। বিদ্যাপতির পদাবলীতে 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' চৈতন্যদেবের ছায়াপাত হইয়াছে। বিদ্যাপতি চৈতন্যোত্তর যুগের কবিদিগকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছেন। (চৈতন্যোত্তর কবিদের প্রসঙ্গেই বিদ্যাপতির আলোচনা করা হইয়াছে। তৎপূর্বে চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী সাহিত্যের ভূমিকা হিসাবে পদাবলী সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব, পদাবলীর শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হইল)।

পদাবলী সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব—চৈতন্যদেব ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে দোল পূর্ণিমার দিন নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তখন হোসেন শাহ গৌড়ের রাজা। তখন দেশে নানা দিকেই প্রবল বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান। মুসলমান শক্তির অত্যাচারে দলে দলে লোক বাধ্য হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেছে। সমাজের উচ্চবর্ণের ব্যক্তিগণ রাজদরবারে চাকুরী গ্রহণ করিয়া বিজাতীয় আচারের মধ্যে নিজদিগকে ডুবাইয়া দিলেন। ঐ সঙ্কটপূর্ণ সময়ে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া দেশের ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করিলেন। সেই প্রসঙ্গ আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে।

শ্রীচৈতন্য ভক্তি ও প্রেমধর্ম প্রচার করিয়া আপামর জনসাধারণের হৃদয় জয় করিয়া লইলেন। তাঁহার প্রেমবিহ্বল মূর্তি ভক্ত কবিগণের অন্তরে এক নূতন দিগন্ত খুলিয়া দিল। শ্রীচৈতন্যের মধ্যে তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম-বিরহিনী শ্রীমতীর প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইলেন। ফলে তাঁহাদের রচিত কাব্য এক নূতন আদর্শে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের সঙ্গে আলোচনার ছলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যে-তাৎপর্য প্রকটিত করিলেন (বৈষ্ণব মতবাদের উৎস—পরিচ্ছেদে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে), তাহা

ঐ যুগের কবিদিগকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিল। প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবিরা রাধা কৃষ্ণ লীলা বর্ণনায় মধুর-রসের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন কিন্তু এই হেমকান্তি সন্ন্যাসীর শুদ্ধ ও পবিত্র আচরণ তাঁহাদিগকে সংযত করিল। চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং মানসে অবস্থান করাইয়া তখনকার কবিরা পদ রচনা করিলেন। মহাপ্রভুর নূতন ধর্ম শুধু এক সুবিপুল কাব্যসৃষ্টিরই প্রেরণা দিল না ইহা নূতন দর্শন ও অলঙ্কার শাস্ত্র-সৃষ্টিরও মূলীভূত কারণ হইয়া দাঁড়াইল। বৈষ্ণব কবিরা ঐ দর্শন ও অলঙ্কার শাস্ত্র-নির্দেশিত পথেই তাঁহাদের অনুপম কাব্যকুসুম ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোধানের (পুরীতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে আষাঢ় মাসে) পর একদল অসাধারণ পণ্ডিত ও প্রচারক মণ্ডলীর সহযোগিতায় এই ধর্ম বাঙ্গালী জাতির মর্মমূলে প্রবেশ করে।

চৈতন্যোত্তর যুগের কবিবৃন্দ

ষোড়শ শতাব্দী—(১) নরহরি সরকার (২) লোচনদাস (৩) জ্ঞানদাস (৪) বলরাম দাস (৫) বাসুদেব ঘোষ (৬) গোবিন্দ ঘোষ (৭) মাধব ঘোষ (৮) বংশীবদন চট্ট (৯) বাসুদেব দত্ত (১০) মুরারি গুপ্ত (১১) মুকুন্দ দত্ত (১২) গোবিন্দ আচার্য (১৩) রামানন্দ বসু (১৪) নয়নানন্দ মিশ্র (১৫) শিবানন্দ চক্রবর্তী (১৬) যদুনন্দন চক্রবর্তী (১৭) উদ্ধব দাস (১৮) অনন্ত দাস (১৯) কবিশেখর বা রায় শেখর (২০) চৈতন্য দাস (২১) কৃষ্ণদাস (২২) দুঃখী শ্যামদাস।

ইঁহাদের প্রায় সকলেই চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দী—(১) গোবিন্দদাস কবিরাজ (২) নরোত্তম দাস (৩) ঘনশ্যাম দাস।

অষ্টাদশ শতাব্দী—(১) চন্দ্রশেখর (২) শশিশেখর (৩) রাধামোহন (৪) নরহরি ওরফে ঘনশ্যাম চক্রবর্তী।

চৈতন্য-সমসাময়িক বৈষ্ণব আচার্যগণ—অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, হরিদাস।

নবদ্বীপের প্রধান অনুচরগণ—শ্রীবাস পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব ঘোষ, গদাধর পণ্ডিত।

নীলাচলের অনুচর ও পারিষদগণ—স্বরূপ-দামোদর, রামানন্দ রায়, গদাধর পণ্ডিত, হরিদাস, কালী মিশ্র, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, পরমানন্দ পুরী, রঘুনাথ দাস, জগদানন্দ পণ্ডিত।

বৃন্দাবনের ষট্ গোস্বামী—(১) রঘুনাথ দাস (২) রঘুনাথ ভট্ট (৩) গোপাল ভট্ট (৪) রূপ (৫) সনাতন (৬) জীব। ইঁহাদের মধ্যে শুধু জীব গোস্বামী চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করেন নাই। এই গোস্বামীরা চৈতন্যদেবের নির্দেশে বৃন্দাবনে থাকিয়া বৈষ্ণব-শাস্ত্র রচনা করেন এবং বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। ইঁহারাই বৃন্দাবনের তীর্থ সকল প্রকটিত করেন এবং প্রধান প্রধান বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্র—রূপ গোস্বামীর—(১) ভক্তিরসামৃত সিন্ধু (২) উজ্জ্বলনীলমণি; লোচন দাসের—দুর্লভসার; কবিবল্লভের রসকদম্ব। বৈষ্ণব কবিতা রচনায় বৈষ্ণব কবিরা এই সকল রসশাস্ত্রের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেন। এইজন্য বৈষ্ণব কবিতাকে বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাষ্য বলা হয়।

বৈষ্ণব কাব্য-সঙ্কলন গ্রন্থ—সপ্তদশ শতাব্দী হইতে এই সকল সঙ্কলন গ্রন্থের কাজ সুরু হয়।

সপ্তদশ শতাব্দী—রামগোপাল দাস—রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী এবং চৈতন্যতত্ত্বসার। নিত্যানন্দ দাস—প্রেম বিলাস। (শ্রীনিবাস আচার্য ও তাঁহার সহকর্মীদের অনেক তথ্য। বাঙ্গলায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের

ইতিহাস)। নন্দকিশোর দাস—রসপুষ্পকলিকা বা রসকলিকা। পীতাম্বর—রসমঞ্জরী, অষ্টরস ব্যাখ্যা। মনোহর দাস—দিনমণি চন্দ্রোদয়।

অষ্টাদশ শতাব্দী—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী—ক্ষণদাগীতচিন্তামণি। নরহরি চক্রবর্তী—গীতচন্দ্রোদয়। রাধামোহন ঠাকুর—পদামৃত সমুদ্র। দীনবন্ধু দাস—সঙ্কীর্তনামৃত। রাধামুকুন্দ দাস—মুকুন্দানন্দ। কমলাকান্ত—পদরত্নাকর। গোকুলানন্দ সেন—পদকল্পতরু—শ্রেষ্ঠ সঙ্কলন গ্রন্থ। ইহাতে দেড়শতের অধিক বৈষ্ণব পদকর্তার ৩১০১টি পদ আছে।

বৈষ্ণব কবিতার শ্রেণীবিভাগ—বিদ্যাপতির পদাবলী হইতেই বৈষ্ণব কবিতার শ্রেণী বিভাগটি স্পষ্ট হইয়া উঠে। অতঃপর চৈতন্যোত্তর যুগে রসশাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী নায়িকা বিভাগ ও পদাবলী বিভাগ করা হয়।

পদাবলী বিভাগ—(১) গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক (২) শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা (৩) রূপবর্ণনা (৪) পূর্বরাগ ও অনুরাগ (৫) রূপানুরাগ (৬) অভিসার (৭) মান ও কলহান্তরিতা (৮) বংশী ও নৃত্যশিক্ষা (৯) প্রেম-বৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ (১০) মাথুর প্রবাস বা বিরহ (১১) ভাবোল্লাস ও মিলন বা ভাবসম্মিলন (১২) নিবেদন (১৩) প্রার্থনা।

বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হইতেছে।

মধুর রসকেই শৃঙ্গার রস বলা হয়। শৃঙ্গার রসের দুইটি ভেদ: বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। নায়ক নায়িকার মিলনের পূর্বের বিভিন্ন অবস্থা সঞ্জাত রসই হইল বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের রস। পূর্বরাগ, মান, প্রবাস, প্রেমবৈচিত্ত্য, রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ এইগুলি বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের অন্তর্গত। বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারই সম্ভোগাত্মক শৃঙ্গারকে স্পষ্ট করিয়া তোলে। ভাবোল্লাস বা মিলন হইতেছে সম্ভোগাত্মক শৃঙ্গার।

পদাবলীর নায়িকার শ্রেণীবিভাগ—পদাবলীর নায়িকাকে বিভিন্ন অবস্থানুযায়ী আটটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। ইহাই নায়িকার

'অষ্ট অবস্থা'। (১) অভিসারিকা—প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের জন্য সঙ্কেতিত কুঞ্জে গমনকারিণী (২) বাসর সজ্জা—প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের জন্য নিজদেহ ও কুঞ্জ সজ্জিত করিতে নিরতা (৩) উৎকণ্ঠিতা—সঙ্কেত কুঞ্জে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের জন্য প্রতীক্ষারতা (৪) বিপ্রলব্ধা—প্রিয়তমের দ্বারা প্রতারিতা (৫) খণ্ডিতা—প্রতিনায়িকার নিকট হইতে আগমনরত নায়ককে দেখিয়া রুষ্টা (৬) কলহান্তরিতা—খণ্ডিতা নায়িকা মান করিয়া থাকেন—মানে নায়ককে হারাইয়া অনুতপ্তা (৭) প্রোষিতভর্তৃকা—কৃষ্ণের বিদেশ অর্থাৎ মথুরা গমনে রাধার বিরহিণী অবস্থা (৮) স্বাধীনভর্তৃকা—নায়ককে নিজের অধিকারের মধ্যে লাভকারিণী।

পদাবলীর সঙ্গীত সম্পদ ও কীর্তন—পদাবলীর যে-শুধু অপূর্ব কাব্যসম্পদেরই আকর তাহা নহে ইহা এক মনোরম সঙ্গীত রীতিকেও বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। বৈষ্ণব পদকারগণের অনেকেই সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন। যে-কীর্তন সঙ্গীত বাঙ্গালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ বৈষ্ণব পদকারগণই তাহার স্রষ্টিকর্তা। এই কীর্তনের পুরোভাগে ছিলেন শ্রীচৈতন্য। তিনিই দলবদ্ধভাবে নগর সঙ্কীর্তনের প্রবর্তক। পালাবন্দী পদাবলী-কীর্তন-রীতির প্রথম সূত্রপাত হয় খেতরীর উৎসবে। এই উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন নরোত্তম দাস। খেতরী (মালদহ জেলার পদ্মাতীরে) তাঁহার জন্মস্থান। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের এবং রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নরোত্তম এক বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। ইহাতে বাঙ্গলা দেশের সকল বিশিষ্ট বৈষ্ণবেরা যোগদান করিয়াছিলেন। এই উৎসবে যে-কীর্তন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় স্থানীয় পরগণা গড়ানহাটীর নামানুসারে ইহার নাম হয় গড়ানহাটী কীর্তন। পশ্চিমবঙ্গের রাণীহাটী, মান্দারণ, ঝাড়খণ্ড, মনোহরসাহী ইত্যাদি পরগণার নামানুসারে (ঐ সকল অঞ্চলে বৈষ্ণব

সংস্কৃতি ছিল) রেণেটী, মান্দারনী, ঝাড়খণ্ডী ও মনোহরসাহী কীর্তনের উদ্ভব হয়।

গৌরচন্দ্রিকা

গৌরচন্দ্রকে লইয়া রচিত পদমাত্রই গৌরচন্দ্রিকা নহে।

সাধারণভাবে গৌরচন্দ্রিকা কথাটির অর্থ হইতেছে গৌরচন্দ্র সম্বন্ধীয় কোন কিছু বা গৌরাঙ্গরূপ চন্দ্রের কিরণ। এই সাধারণ অর্থে বৈষ্ণব পদাবলীর গৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় যাবতীয় পদকেই গৌরচন্দ্রিকা বলিতে হয়। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে এই অর্থে গৌরচন্দ্রিকাকে গ্রহণ করিলে চলিবে না। বৈষ্ণব পদাবলীতে বিশেষ করিয়া পালাবদ্ধ রসকীর্তনের ক্ষেত্রেই গৌরচন্দ্রিকার বিশেষ অধিকার অর্থাৎ ঐ ক্ষেত্রে গৌরচন্দ্রিকা একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমলীলাকে পরিণতির নানা স্তরে বিভক্ত একটি সমগ্র মানবিক প্রেমকাহিনীরূপে কল্পনা করিয়া বৈষ্ণব কবিরা ইহাকে পূর্বরাগ, মিলন, মান, অভিসার, বিরহ, মাথুর-বিরহ, ভাবসম্মিলন প্রভৃতি বিভিন্ন পালাতে বিন্যস্ত করিয়া ইহাকে একটি সুনির্দিষ্ট রসপরিণতি দিয়াছেন। এই সকল পালা সম্পর্কে বিভিন্ন কবির রচিত পদগুলিকে অর্থাৎ সমরসের পদাবলী যথাক্রমে সাজাইয়া যে লীলাগান করা হয় তাহাকেই পালাবদ্ধ কীর্তন বলা হয়। ঐ পালাবদ্ধ লীলাকীর্তনের সময়ে যে-বিষয়ের, যে-রসের কৃষ্ণলীলা গীত হইবে, তাহার ভূমিকা হিসাবে সেই পালার রসদ্যোতক যে গৌরপদ গীত হয় তাহাই বিশিষ্টার্থে প্রকৃত গৌরচন্দ্রিকা। বিভিন্ন লীলারসের জন্য বিভিন্ন গৌরচন্দ্রিকা গীত হইয়া থাকে। কিন্তু কেন?

বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনি রাধা ও কৃষ্ণের যুগলবিগ্রহ। অন্তরঙ্গে তিনি কৃষ্ণ, বহিরঙ্গে তিনি রাধা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বে আমরা দেখিয়াছি যে, ভাব-বৃন্দাবনে কান্ত কৃষ্ণের সঙ্গে কান্তারূপ ভক্তের (যাহার প্রতীক শ্রীরাধা) প্রেমলীলাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের একমাত্র কাম্য। এই প্রেমলীলা বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ শৃঙ্গার অনুযায়ী অর্থাৎ মধুর রসের অনুবর্তী হওয়া চাই। রাধাভাবে ভাবিত মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ছিলেন বিপ্রলম্ভের মূর্তিমান বিগ্রহ। কান্ত কৃষ্ণের সঙ্গে কান্তা গৌরচন্দ্রের মানস প্রেমলীলা তাঁহার ভক্তমণ্ডলী বারবার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদে এই লীলার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছিল। মহাপ্রভুর মধ্যেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব রাধা-কৃষ্ণের অলৌকিক প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার বহুবিচিত্র ভাবলীলার কোন্‌টিতে রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার কোন্ বিশেষ দিকটি ব্যঞ্জিত হইয়াছে তাহা তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর ধর্মসাধনার মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের যে-প্রগাঢ়তা ছিল, শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য যে-আকুলতা ছিল তাহা বিরহিণী শ্রীরাধার প্রেমবিহ্বলতার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। মহাপ্রভুর এই প্রেমলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তদের মধ্যে অনেকেই কবি ছিলেন; যেমন—বংশীবদন চট্ট, নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি। তাঁহারা গৌরচন্দ্রের ভাববিলাসের বিভিন্ন চিত্র তাঁহাদের রচিত কবিতায় নিপুণ চিত্রকরের মত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা গৌরলীলাকে বৃন্দাবনলীলার ভাবপ্রতিরূপ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাজেই বৃন্দাবনলীলার ভূমিকারূপে কীর্তনের আসরে যে, গৌরলীলা গীত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি! এই গৌরচন্দ্রিকা শুনিবামাত্রই রসজ্ঞ শ্রোতা বুঝিতে পারেন যে, আসরে বৃন্দাবনলীলার কোন্ সুরটি গীত হইবে। যেমন—

আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ।
করতলে বয়ান করই অবলম্ব ॥

খনে খনে গতাগতি করু ঘরপন্থ।
খনে খনে ফুলবনে চলই একান্ত ॥

অথবা,

সহচর অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া।
চলিতে না পারে খেনে পড়ে মূরছিয়া ॥
অতি দুরবল দেহ ধরণে না যায়।
ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর মুখ চায় ॥
কোথায় পরাণনাথ বলি খেনে কান্দে।
পূরব বিরহ-জ্বরে থির নাহি বান্ধে ॥

এই গৌরচন্দ্রিকা যখন গীত হয় তখন পূর্বরাগে উদ্বেগাকুল শ্রীরাধার চিত্রই শ্রোতার মানসনয়নে ফুটিয়া উঠে। তাহার নয়নে ভাসিয়া উঠে শ্রীরাধার এই মূর্তি—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্বকাননে চায় ॥

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বৈষ্ণবের তত্ত্বদৃষ্টিতে গৌরচন্দ্র একাধারে রাধা ও কৃষ্ণ। এই উভয় ভাবেরই গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রহিয়াছে। তবে রাধা-কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ-সম্ভোগাত্মক প্রেমানন্দই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কাম্য। আর মহাপ্রভু ছিলেন বিপ্রলম্ভের মূর্ত প্রতীক। কাজেই রাধাভাবে ভাবিত গৌরচন্দ্রের রূপই গৌরচন্দ্রিকায় অধিক স্থান পাইয়াছে। মাথুর বা বিরহের গৌরচন্দ্রিকায় মহাপ্রভুর ভাব হইতেছে রাধাভাব।

কৃষ্ণভাব লইয়াও বহু গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ রহিয়াছে। ঐ সকল পদের অনেকগুলি গৌরচন্দ্রিকারূপেও গীত হয়। কৃষ্ণের বাল্যলীলা,

কালীয়দমন, পূর্বগোষ্ঠ, উত্তরগোষ্ঠ প্রভৃতির গৌরচন্দ্রিকায় গৌরের কৃষ্ণভাব। এই সকল পদকে ব্যাপক অর্থে গৌরচন্দ্রিকা বলিলেও বিশিষ্টার্থে ঐগুলি গৌরচন্দ্রিকা নহে। তেমনি প্রেমাবতার গৌরচন্দ্রের নগরকীর্তন, নামকীর্তন, বৃন্দাবনলীলাকীর্তন প্রভৃতি সর্বপ্রকার কীর্তনের পুরোভাগে অধিষ্ঠান একান্তই স্বাভাবিক। ঐ সকল কীর্তনের প্রারম্ভে গীত গৌরপদগুলিকেও সাধারণভাবে গৌরচন্দ্রিকা বলা হয়।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ হইলেই তাহাকে গৌরচন্দ্রিকা বলা যায় না। গৌরচন্দ্রকে লইয়া বৈষ্ণব কবিরা অসংখ্য পদ রচনা করিয়াছেন। গৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক কালের এবং চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব মহাজনেরা শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়াছেন অন্তরে কৃষ্ণ, বাহিরে রাধারূপে। কিন্তু তাঁহার 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ' মূর্তিই বৈষ্ণবপদকর্তাদের ভাবকল্পনাকে অধিকতর উজ্জীবিত করিয়াছে। ইহা ছাড়া গৌরাঙ্গবিষয়ক অন্য যে-সব পদ আছে সেগুলি মুখ্যতঃ মহাপ্রভুর মহিমাজ্ঞাপক অথবা মাহাত্ম্যজ্ঞাপক। এইগুলি স্থূল অর্থে গৌরচন্দ্রিকা হইলেও বিশিষ্টার্থে নয়। গৌরাঙ্গবিষয়ক যে-সব পদে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস আভাসিত হয় নাই সেই সব পদকে গৌরচন্দ্রিকা বলা চলে না। যেমন—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব ॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌরকিশোর।

ইত্যাদি পদটি। এই পদটিতে অভিনব কল্পতরুসম নটবর গৌরকিশোরের রূপ ও মহিমা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এই পদটিতে 'অবিরত প্রেমফল বিতরণে অখিল মনোরথ পূর'—দয়াল প্রেমের ঠাকুরের চিত্র থাকিলেও

ইহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস আভাসিত হয় নাই। কাজেই ইহা গৌরপদ হইলেও গৌরচন্দ্রিকা নহে। তেমনই—

চম্পক শোন— কুসুম কনকাচল
জিতল গৌর-তনু-লাবণি রে।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব
জগ-মনোমোহন ভাঙনি রে॥
জয় শচীনন্দন রে।

অথবা,

পরশ-মণির সাথে কি দিব তুলনা রে
পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাইয়া রে
রতন হইল কত জনা॥

অথবা সন্ন্যাসব্রতধারী গৌরাঙ্গের,—

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ-বসন পরে
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কি লাগিয়া মুখ-চাঁদে রাধা রাধা বলি কাঁদে
কি লাগিয়া ছাড়িল নিজ দেশ॥

প্রভৃতি পদে গৌরাঙ্গের বিভিন্ন রূপবৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিলেও ইহারা গৌরচন্দ্রিকা নহে। বৈষ্ণব সাহিত্যে গৌরচন্দ্রিকা কথাটির প্রয়োগ হয় রাধা-কৃষ্ণের পালাবদ্ধ লীলাকীর্তনের অংশরূপে। এই পালাকীর্তনে যে-রসের অবতারণা করা হয় তাহার রসদ্যোতক ও ভাবানুকূল যে গৌরপদ পালার প্রারম্ভে গীত হয় তাহাই গৌরচন্দ্রিকা। গৌরপদ রসকীর্তনের অচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ নহে, এইগুলি অনেকটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও গৌরাঙ্গলীলার পরিপোষক। কিন্তু গৌরচন্দ্রিকাকে রাধাকৃষ্ণের লীলা-

কীর্তন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে চলিবে না কারণ ইহা লীলা-কীর্তনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ ও ভূমিকা স্বরূপ।

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার ভূমিকাস্বরূপ চৈতন্যদেবের পুণ্যলীলাকে স্মরণ করিবার আর একটি কারণও আছে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা শ্রবণ করিলে সাধারণ নরনারীর প্রেমকাহিনী বলিয়াই মনে হইতে পারে। কিন্তু তৎপূর্বে চৈতন্যলীলা স্মরণ করিলে শ্রোতার মন রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে আশ্রয় করিয়া কামগন্ধহীন বৈকুণ্ঠলোকে পৌছিতে পারে। গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলি একবিন্দু কর্পূরের মত ব্রজলীলাকে মধুর ও সুবাসিত করিয়া তোলে। এইদিক দিয়াও গৌরচন্দ্রিকা গীত হইবার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে।

গৌরচন্দ্রিকা চৈতন্যদেবের জীবনালেখ্য

বৈষ্ণব সাহিত্যে গৌরচন্দ্রিকা কথাটির প্রয়োগ হয় রাধাকৃষ্ণের পালাবদ্ধ লীলাকীর্তনের অংশরূপে। এই পালাকীর্তনে যে-রসের অবতারণা করা হয় তাহার রসদ্যোতক ও ভাবানুকূল যে-গৌরপদ পালার প্রারম্ভে গীত হয় তাহাই গৌরচন্দ্রিকা। গৌরচন্দ্রিকার পদগুলির প্রয়োগ এইরূপ বিশিষ্টার্থে হইলেও এই পদগুলিতে গৌরচন্দ্রের জীবনের বিভিন্ন দিকের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। গৌরচন্দ্রিকাকে রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে চলিবে না। কারণ ইহা লীলাকীর্তনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ ও ভূমিকাস্বরূপ।

গৌরাঙ্গদেবের রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত জীবনের আলেখ্যই যে, শুধু গৌরচন্দ্রিকায় ফুটিয়া উঠিয়াছে এমন নয়, তাঁহার সন্ন্যাস জীবনের ছবি এবং প্রেমাবতারের রূপটিও ঐ সকল পদে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে বিশিষ্টার্থে এই পদগুলি গৌরচন্দ্রিকা নহে। এইগুলিকে গৌরাঙ্গ

বিষয়ক পদ বলা হইয়া থাকে। অবশ্য সামগ্রিকভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার দ্যোতক গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ এবং চৈতন্যদেবের জীবনের অন্যান্য দিকের উপর যে-সব পদ রচি- হইয়াছে উহাদিগকে সাধারণভাবে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ বলা যাইতে পারে। ঐসকল পদকে অবলম্বন করিয়া চৈতন্যদেবের জীবনের ও চরিত্রের একটি চমৎকার আলেখ্য নির্মাণ করা যাইতে পারে। যেমন,—'নীরদ নয়নে, নীরঘনসিঞ্চনে' পদটি। এই পদটিতে জীবন্ত প্রেমভাবের বিগ্রহ মহাপ্রভুর মূর্তিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রেমে বিভোর দয়াল ঠাকুর সুরধুনীতীর উজ্জ্বল করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি স্বর্গীয় বৃক্ষ কল্পতরুর মতই অকৃপণ। ভক্তরা এই অভিনব কল্পতরুর নিকট হইতে তাঁহাদের অভীষ্ট বস্তু লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। এই পদটিতে যদিও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা আভাসিত হয় নাই এবং সেই অর্থে ইহাকে গৌরচন্দ্রিকা বলা যায় না, তথাপি নবদ্বীপের পথে পথে প্রেমবিতরণকারী চৈতন্যদেবের মূর্তিটি এই পদে অত্যন্ত মনোহর ভঙ্গীতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পদটি গোবিন্দদাসের রচনা। গৌরচন্দ্রিকা বর্ণনায় গোবিন্দদাস প্রভূত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

গোবিন্দদাসেরই অপর একটি পদ 'চম্পক শোনকুসুম কনকাচল…'। উন্নত গ্রীবাবিশিষ্ট গৌরচন্দ্রের দেহসুষমা এই পদে বর্ণিত হইয়াছে। গৌরদেহের লাবণ্য চম্পক, শোনপুষ্প এবং সুবর্ণগিরিকে পরাজিত করিয়াছে। সেই হেমকান্তি মহামানবের অন্তর প্রেমে ভরপুর। তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, গদগদকণ্ঠে মধুর বচন ধ্বনিত করিতেছেন। কখনও বা প্রেমবন্যায় তাঁহার হৃদয় প্লাবিত হওয়ায় দুই চোখ হইতে মন্দাকিনীধারা বহির্গত হইতেছে। প্রেমে বিভোর মহাপ্রভুর যে মূর্তিটি আমাদের মানসপটে চিরমুদ্রিত রহিয়াছে এই পদটিতে তাহাই যেন বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই পদটিও বিশিষ্টার্থে গৌরচন্দ্রিকা নহে। এইটি গৌরাঙ্গদেবের যেন একটি জীবনালেখ্য।

গোবিন্দদাসের অপর একটি পদ উল্লেখ করা যাইতেছে। মহাপ্রভু আ-দ্বিজচণ্ডালে প্রেম ও ভক্তি বিতরণ করিয়াছিলেন, মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ তাঁহার কাছে ছিল না। বরং যাহারা সমাজে পতিত, অবহেলিত ছিল তাহাদের প্রতি প্রভুর করুণা ছিল অপরিসীম, 'পতিত হেরিয়া কাঁদে, স্থির নাহি বাঁধে, করুণ নয়নে চায়'। অতুল্য স্বর্ণনিন্দিত উজ্জ্বল-কান্তি গৌরাঙ্গদেবের দেহ ঘন ঘন ভূমিতে পড়িয়া যাইতেছে, প্রেমে তিনি বিভোর। তিনি বর্ণাশ্রমের বিভিন্নতা এবং ধনী বা দরিদ্র কাহারও প্রভেদ বা দোষ গণ্য করেন না। প্রেমধনরূপ অমূল্য রত্নে তিনি সমস্ত পৃথিবীবাসীদিগকে ধনী করিলেন। এই পদটিতেও প্রেমাবতারের জীবনের একটি সুন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, যদিও বিশিষ্টার্থের কথা বিবেচনা করিলে ইহাকেও গৌরচন্দ্রিকা বলা যায় না।

গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর তিরোধানের অনেক পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুকে স্বচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই। তবুও তাঁহার অসাধারণ কবিকল্পনা ছিল বলিয়া এবং তিনি চৈতন্যদেবের প্রশিষ্য ছিলেন বলিয়া মহাপ্রভুর প্রেমঘন মূর্ত্তিটি অতি সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন।

বাসুদেব ঘোষ মহাপ্রভুর লীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা, এইজন্যই তিনি মহাপ্রভুর ভাববিলাসের বিভিন্নরূপ নিপুণ চিত্রকরের মত ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন, ইহার পূর্বাভাস পাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া বিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে শাশুড়ী শচীমাতাকে তাঁহার এই দুশ্চিন্তার কথা ব্যক্ত করিতেছেন; বিষ্ণুপ্রিয়ার এই নিদারুণ অমঙ্গল আশঙ্কা বাসুদেব ঘোষের, 'পাগলিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ভিজা বস্ত্র চুলে' এই পদটিতে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও এই পদটিতে গৌরাঙ্গদেবের প্রত্যক্ষ বর্ণনা নাই, তবু পরোক্ষে সন্ন্যাসব্রতধারী চৈতন্যদেব আমাদের

নয়নসম্মুখে প্রতিভাত হন। এই পদটিও গৌরচন্দ্রিকা নহে। বাসু ঘোষের, 'কি লাগিয়া দণ্ড ধরে, অরুণ বসন পরে, কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ' এই পদটিতে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসব্রতধারী মূর্তিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। চৈতন্যদেব গৈরিকবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, হস্তে তাঁহার দণ্ড; তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া বিপুল বিশ্বে নিজেকে বিস্তার করিয়া দিতেছেন। তাঁহার দুই চক্ষু হইতে উষ্ণ প্রেমাশ্রু বহির্গত হইতেছে। সকলে তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য সাধ্যসাধনা করিতেছেন। কিন্তু তিনি রাধা রাধা বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নিজদেশ পরিত্যাগ করিলেন। ইহাও গৌরচন্দ্রিকা নহে।

বাসুদেব ঘোষের, 'আজিকার স্বপনের কথা', এই পদটিতে শচীমাতার স্বপ্নের কথা বর্ণিত হইলেও চৈতন্যদেবের জীবনের একটি সুন্দর চিত্র আমরা দেখিতে পাই। শচীমাতা স্বপ্ন দেখিতেছেন,—

ঘরেতে শুতিয়াছিলাম অচেতনে বাহির হৈলাম
নিমাইয়ের গলার সাড়া পাঞা,
আমার চরণের ধূলি নিল নিমাই শিরে তুলি
পুন কাঁদে গলায় ধরিয়া

তোমার প্রেমের বশে ফিরি আমি দেশে দেশে
রহিতে নারিলাম নীলাচলে।
তোমারে দেখিবার তরে আইলাম নদীয়াপুরে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে॥

আইস মোর বাছা বলি হিয়ার মাঝারে তুলি
হেনকালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
পুন না দেখিয়া তারে পরাণ কেমন করে
কাঁদিয়া রজনী পোহাইল॥

চৈতন্যলীলার অপর একজন প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা গোবিন্দ ঘোষের, 'হেদেরে নদীয়াবাসি করে মুখ চাও' পদটিতে চৈতন্যদেবের যে মূর্ত্তিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা স্বভাবতই আমাদিগকে আকুল বৃন্দাবনবাসীদের কাতর অনুনয় উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনের চিত্রটি মনে করাইয়া দেয়।

পরমানন্দ ঠাকুর তাঁহার, 'পরশ-মণির সাথে, কি দিব তুলনা রে' পদটিতে গৌরাঙ্গদেবের করুণাঘন মূর্ত্তিটি অঙ্কিত করিয়াছেন। গৌরাঙ্গদেবের গুণ স্পর্শমণি, কামধেনু অথবা কল্পতরু প্রভৃতি সব কিছুর অপেক্ষাই অধিক। তিনি অযাচিতভাবে আপামর সকলকেই প্রেমধন বিলাইয়া দেন। ইহাও বিশিষ্টার্থে গৌরচন্দ্রিকা নহে।

বল্লভদাসের, 'নিতাই করিয়া আগে, চলিলেন অনুরাগে, আইলা সবাই শান্তিপুরে' পদটিতে সন্ন্যাসগ্রহণের পর চৈতন্যদেবের সঙ্গে শচীমাতার মিলনের করুণ দৃশ্যটি অত্যন্ত জীবন্ত হইয়া বিকশিত হইয়াছে। সন্ন্যাসী পুত্র মাতাকে প্রণাম করিতে গেলে মাতা তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং পুত্র কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে পুনঃপুনঃ সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলেন। শচীমাতা যখন—

এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়া দণ্ড ধরি
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি,
জীবন্ত থাকিতে মায় ইহা নাহি সহা যায়
কার বোলে হইলা বৈরাগী ॥

বলেন তখন পাষাণের অন্তরও বিদীর্ণ হইয়া যায়। ঐ পদেরই প্রারম্ভে—

নিতাই করিয়া আগে চলিলেন অনুরাগে
আইলা সবাই শান্তিপুরে।
মুড়াইছে মাথার কেশ ধর‍্যাছে সন্ন্যাসীর বেশ
দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে ॥

করযোড় করি আগে দাঁড়াইলা মায়ের আগে
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া,
দুই হাত তুলি বুকে [illegible] দিয়া চাঁদ-মুখে
কাঁদে শচী গলায় ধরিয়া ॥

বর্ণনার মধ্য দিয়া মহাপ্রভু যেন মূর্তিমান বিগ্রহরূপে আমাদের নয়ন সম্মুখে প্রতিভাত হন।

রাধামোহন ঠাকুরের—

আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ।
করতলে করই বয়ন অবলম্ব
পুন পুন গতাগতি করু ঘরপন্থ,
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত ॥

এবং জ্ঞানদাসের—

সহচর-অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া,
চলিতে না পারে খেনে পড়ে মুরছিয়া ॥
অতি দুরবল দেহ ধরণে না যায়।
ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর-মুখ চায় ॥
কোথায় পরাণ নাথ বলি খেনে কান্দে।
পূরব বিরহ-জ্বরে থির নাহি বান্ধে ॥

এই দুইটি পদে রাধাভাবে ভাবিত গৌরচন্দ্রের বিরহাকুল মূর্তিটি আমাদের নয়ন সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

মহাপ্রভুর জীবন-কাহিনী ছিল অলৌকিক। রাধাভাবে ভাবিত হইয়া তিনি লীলারসে নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না, তিনি কখনও কাঁদিতেন, কখনও আবেশে নৃত্য করিতেন, কখনও বা তাঁহার দেহে প্রেমজনিত স্বেদ, কম্প, অশ্রু, পুলক ইত্যাদি বিকার দেখা

দিত। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদকর্তাগণ মহাপ্রভুর এই ভাববিলাস সুনিপুণ চিত্রকরের মত তাঁহাদের রচিত পদে চিত্রায়িত করিয়াছেন।

বাল্যলীলা ও কালীয়দমন

বাল্যলীলার পদগুলিতে বাৎসল্যরসের প্রকাশ। ইহার স্থায়ীভাব 'বৎসলতা' নামে রতি। এইখানে কৃষ্ণের বা ভগবানের সঙ্গে ভক্তের পাল্য-পালক সম্পর্ক অর্থাৎ ভক্ত মাতা বা পিতা এবং ভগবান সন্তান। সন্তানকে মাতা-পিতা অন্তরের যে-স্নেহ ভালবাসা লইয়া লালন পালন করেন, প্রয়োজন হইলে তাড়না ও ভর্ৎসনা করেন এইখানেও তাই। বাৎসল্যরসের পদগুলিতে শান্তের কৃষ্ণ-নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের বিশ্বাস বিদ্যমান, তদুপরি মাতাপিতার মমতা ইহাদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া এই পদগুলিকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে।

শিশু যখন হাঁটিতে শিখে, নাচিতে পারে তখন মায়ের কত আনন্দ। গোপাল নাচিতে শিখিয়াছে—

দেখসিয়া রামের মাগো গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া।
কোথা গেল নন্দ রায় আনন্দ বহিয়া যায়
নয়ন ভরিয়া দেখসিয়া। (যাদবেন্দ্র)

যশোমতী গোপালের মুখচুম্বন করিয়া আবার তাহাকে নাচিতে বলেন। নাচিবার জন্য তাহাকে ক্ষীর-ননী খাইতে দেওয়ার লোভ দেখান—

কহে শুন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীর-ননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে॥

রাণী দিল পূরি কর খাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল তায়।
খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায়॥ (ঘনরাম দাস)

পুত্র দোষ করিলে মা তাহাকে যখন তাড়না করিয়া থাকেন তখন পুত্রের আর অভিমানের সীমা থাকে না। এই ভাবটি বলরাম দাসের একটি পদে বাস্তব রসাশ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে—

দাঁড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে
বুক বাহিয়া পড়ে ধারা।
না থাকিব তোমা ঘরে অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া বলে ননি-চোরা॥

কৃষ্ণ সখাগণের সহিত ধেনু চরাইতে যাইবেন। মায়ের প্রাণ আতঙ্কে মরে। তাই যশোদা বলেন—

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতিদূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে॥

মায়ের মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না। তাই সখাদের তিনি বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দেন—

সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় যদি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন॥ (বলরাম দাস)

গোপাল ভারি দুষ্টু, মায়ের কথা শুনিবে কিনা কে জানে? হয়তো ছুটিয়া ধেনুগণের আগে যাইবে, তাহারা তখন হয়তো শিং দিয়া গুঁতাইয়া দিবে। মায়ের মন অমঙ্গলের আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া যায়। যাদবেন্দ্র দাসের এই পদটি যেন মাতৃহৃদয় ছানিয়া রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে—

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বামভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে॥
ক্ষুধা পেলে চাঞা খাইও পথ-পানে চাহি যাইও
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥

বাল্যলীলায় সখ্যরসের পদও রহিয়াছে। সখাগণকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ গোষ্ঠে গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নানা আনন্দ-খেলা চলিতেছে— এই ধরণের পদ বাল্যলীলায় দেখিতে পাওয়া যায়।

বিবিধ কুসুম দিয়া সিংহাসন নিরমিয়া
কানাই বসিলা রাজাসনে।
রচিয়া ফুলের দাম ছত্র ধরে বলরাম
গদ গদ নেহারে বদনে॥ (উদ্ধব দাস)

গোধূলি ঘনাইয়া আসিয়াছে। 'কৃষ্ণ চাঁদমুখে বেণু দিয়া' ধেনুগণকে একত্র করিয়া সখাগণকে লইয়া ঘরে ফিরিতেছেন—

শ্বেত-কান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘন-শ্যাম॥ (বলরাম দাস)

কালিন্দীর এক হ্রদে কালীয় নাগ বাস করে। তাহার অত্যাচারে সকলে অস্থির—

বিষ উথলিয়া জলে প্রাণী যায় যদি কূলে
জলের বাতাস পাঞা মরে।
স্থাবর জঙ্গম যত কূলে মরি আছে কত
বিষ-জ্বালা সহিতে না পারে॥

সেই কালীয় নাগকে দমন করিবার জন্য বালক কৃষ্ণ হ্রদে নামিলেন। তাঁহাকে আর উঠিতে না দেখিয়া ব্রজবাসিগণ কাঁদিয়া আকুল। অতঃপর সেই নাগকে দমন করিয়া তিনি তীরে উঠিলেন। ব্রজবাসিগণের আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল—

বিষ-জলে জনু দাহন ভেল।
ব্রজ-প্রেমামৃতে শীতল কৈল॥
যৈছন যাহে করই সম্ভাষ।
সবহুঁ আলিঙ্গয়ে গদ-গদ-ভাষ॥ (মাধবদাস)

বৈষ্ণব কবিরা মানবিক প্রেমের আধারেই ভগবৎ প্রেমকে ব্যক্ত করিয়াছেন। কাজেই তাঁহারা মানবের সমস্ত স্নেহ-ভালবাসা-প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছেন। 'যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি

মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে ভুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে।' বাল্যলীলার পদগুলিতে স্নেহার্দ্র ভক্ত-হৃদয় আপনার সন্তানকে বেষ্টন করিয়াই আপনার ঈশ্বরকে খুঁজিয়া পাইয়াছে।

পূর্বরাগ, রূপানুরাগ বা রূপোল্লাস

মিলনের পূর্বে পরস্পরের দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদির দ্বারা নায়ক-নায়িকার চিত্তে যে অনুরাগ জন্মে তাহাকে পূর্বরাগ বলে। পূর্বরাগ বৈষ্ণব পদাবলীতে একটি বিশিষ্ট অংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীরাধার মনে যে-গভীর রূপমুগ্ধতার ভাব আসিয়াছে এবং তাহার ফলে তাহার যে-চিত্তচাঞ্চল্য ও আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে তাহাকে অরলম্বন করিয়া অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা রচিত হইয়াছে। কৃষ্ণের প্রতি রাধার অনুরাগ শুধু যে, কৃষ্ণের রূপকে অবলম্বন করিয়াই সঞ্চার হইয়াছে এমন নহে। কৃষ্ণের নাম শুনিবামাত্রেই রাধার মনে অনুরাগ জন্মিয়া যায়। কারণ কৃষ্ণের প্রতি রাধার অনুরাগ তাঁহার আত্মার মধ্যে রহিয়াছে। আসল কথা কৃষ্ণের অসামান্যতা রাধা নিজের অন্তর দিয়াই সৃষ্টি করিয়া নেন।

বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধার প্রতি কৃষ্ণের আকর্ষণের কথা ও রাধার রূপ দেখিয়া কৃষ্ণের আকৃষ্ট হওয়ার কথাও 'পূর্বরাগ' অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। রাধা যেমন কৃষ্ণকে চাহেন, কৃষ্ণও তেমনি রাধাকে চাহেন—যেমন বাস্তব জগতে নর ও নারী পরস্পরকে আকর্ষণ করে। পূর্বরাগের পদগুলিতে পরমাত্মা-জীবাত্মার পারস্পরিক লীলার কথা থাকিলেও

ইহা এমনভাবে মানবিক প্রেমের আধারে রচিত হইয়াছে যে, এই বিভাগের পদগুলি প্রেমের কবিতা হিসাবে অত্যন্ত চমৎকারভাবে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে

পূর্বরাগের কবিতাতে রাধার পূর্বরাগের কথাই সমধিক প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্বরাগের কবিতায় প্রথমে রূপের প্রতি অনুরাগের কথাটি আসে। এই রূপবর্ণনায় বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস সর্বাধিক দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্বরাগের গভীর ভাব-দ্যোতক ও আর্তিমূলক পদগুলির অধিকাংশই চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের রচনা। রাধার রূপ বর্ণনায় বিশেষ করিয়া নবোদ্ভিন্নযৌবনা রাধার বর্ণনায় বিদ্যাপতি অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রথমতঃ রাধার পূর্বরাগের কথাই আলোচনা করা যাক। রাধা কৃষ্ণের যে-রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন তাহা গোবিন্দদাসের 'ঢল ঢল কাঁচা, অঙ্গের লাবণি'—এই পদটিতে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ তরলতা পূর্ণ লাবণ্যে যেন পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। এই চারু অঙ্গকান্তি দেখিয়া রাধা মুগ্ধ। কৃষ্ণের ঈষৎ হাসির তরঙ্গে মদনও মূর্চ্ছিত হয়, রাধার চিত্ত যে, ব্যাকুল হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি! বিভিন্ন প্রকার অঙ্গভঙ্গি সহকারে কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে, রাধাকে কটাক্ষবাণে বিদ্ধ করিতে করিতে চলিয়াছেন। তাঁহার গলায় মালতী ফুলের মালা, কপালে চন্দনের ফোঁটা। এই রূপ দেখিয়া রাধা আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। (কি করিয়া নাগরের সঙ্গে তিনি মিলিত হইবেন ইহাই হইল তাঁহার চিন্তা) গোবিন্দদাসের—

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ॥

সজনি, অব কি করবি উপদেশ।
কানু-অনুরাগে মোর তনু-মন-মাতল
না শুনে ধরম-লব-লেশ॥

এই পদটিতে রাধার গভীর অনুরাগের কথা, কৃষ্ণের রূপ ও বংশীধ্বনি শ্রবণে তাঁহার তনু-মন মত্ত হওয়ার কথা অপরূপ ভঙ্গিতে রূপায়িত হইয়াছে। কানু তাঁহার শ্রবণ ও মন এমন করিয়া অধিকার করিয়া রহিয়াছেন যাহাতে অন্য কোনদিকে তাঁহার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নাই। তাঁহার এই বেপথুমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া স্বামী ও গুরুজনেরা তর্জন গর্জন করেন। কিন্তু রাধার তাহাতে হাস্যোদ্রেক হয়। কারণ যাঁহার মন শ্যামরূপে আচ্ছন্ন হইয়া আছে এ-সকল তর্জন গর্জন যে, তাঁহার কাছে কত অর্থহীন ইহা গুরুজনেরা কি বুঝিবেন।[১৮]

আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কতশত কোটি কুসুম-শরে জর জর
রহত কি যাত পরাণ॥
সজনি, জানলুঁ বিধি মোহে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম॥

গোবিন্দদাসের এই পদটিতে কৃষ্ণরূপের যে, কিরূপ অসাধারণ সম্মোহন শক্তি তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। অর্ধেকের অর্ধেকেরও অর্ধেক নয়নপ্রান্ত দিয়া কৃষ্ণকে দেখিয়া রাধা মদনবাণে জর্জরিত হইয়াছেন, প্রাণ আছে কি নাই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। সেই হরিকে যে-নারী দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিতে পারে শ্রীরাধা তাহার পায়ে প্রণাম জানাইতেছেন।

বিদ্যাপতির রাধা বহু কিছুর সঙ্গে তুলনা করিয়াও কৃষ্ণের রূপ যে-কি, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কৃষ্ণকে তিনি,—

হাথক দরপণ ম' ।ক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল ॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার ॥
পাখীক পাখ মীনক পাণি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি ॥

এইরূপে বর্ণনা করিয়াও তাঁহার অপরূপত্বের সীমা পাইতেছেন না। তাই তিনি বলিতেছেন ;—

তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ দোহাঁ হোয় ॥

বিদ্যাপতির অপর একটি পদেও রাধার কৃষ্ণরূপের প্রতি গভীর মুগ্ধতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাধা স্থির করিয়াছিলেন কৃষ্ণরূপ যাহাতে দেখিতে না হয় তজ্জন্য তিনি মুখ অবনত করিয়া থাকিবেন। কিন্তু পারিলেন না। কিভাবে তাঁহার রূপমুগ্ধ নয়ন বারেবারে কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইল এবং পরিণামে তাঁহার সর্বাঙ্গ পুলকচঞ্চল হইয়া উঠিল তাহা বিদ্যাপতি মনোহর অর্থালঙ্কারের মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

অবনত আনন কএ হম রহলিহুঁ
বারল লোচন-চোর।
পিয়া-মুখ-রুচি পিবএ ধাওল
জানি সে চাঁদ চকোর ॥
ততহুঁ সঞো হঠে হঠি মোঞে আনল
ধএল চরণ রাখি।
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ
তইঅও পসারএ পাঁখি ॥

কৃষ্ণকে দেখিবার জন্ম রাধার আকুলতার কথা বিদ্যাপতির—

নহাই উঠিল তীরে রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বর কান।
গুরুজন সঙ্গে লাজ ধনি নতমুখী
কৈমনে হেরব বয়ান॥

এই পদটিতে অত্যন্ত চাতুর্য সহকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গলার হার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাহার মুক্তা কুড়াইবার ছলে রাধা কৃষ্ণকে দেখিয়া লইতেছেন।

পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের পদগুলিতে শ্রীরাধার অন্তরের আকুলতা ও হৃদয়ের গভীর আর্তি যে-বেদনাঘন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে সমগ্র পদাবলী কাব্যে তাহা তুলনারহিত। এই বিরলবর্ণ পদগুলিতে মানব-হৃদয়ের আকুলতা যেন রূপপরিগ্রহ করিয়াছে। রাধার মনোরাজ্যেই কৃষ্ণের অধিষ্ঠান। তাই তাঁহার রূপ না দেখিয়াও শুধু তাঁহার নামেই তিনি মুগ্ধ। সেই নাম শ্রবণেই তাঁহার অন্তর বিদ্ধ। সেই নাম জপ করিতে করিতে তাঁহার অঙ্গ অবশ হইয়াছে। তাই তিনি আকুল হইয়া সখীকে প্রশ্ন করিতেছেন—

নাম-পরতাপ যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয়॥

শ্রীমতীর অন্তরের এই গভীর বেদনার কথা কেহ জানে না। কবি চণ্ডীদাস শ্রীমতীর কৃষ্ণরূপমুগ্ধ রূপটি জীবন্ত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন—

রাধার কি হইল অন্তরের ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমত যোগিনী পারা॥

রাধার পূর্বরাগের যে-অবস্থা এই পদগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে মহাপ্রভুর জীবনে অনেকটা সেইরূপ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

পূর্বরাগে নায়িকার চিত্তে যে নিদারুণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় তাহা চণ্ডীদাসের—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়॥

এই পদটিতে বিকশিত হইয়াছে। কৃষ্ণ-প্রেমের জ্বালা যে, কি অসহ্য তাহা চণ্ডীদাস—

অকথন বেয়াধি কহন নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম তার পায়॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায়॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥

এই ছত্র কয়টির মধ্য দিয়া এমনভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যাহা কঠিন-হৃদয় ব্যক্তিরও চক্ষুকে সজল করিয়া তোলে।

চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণপ্রেমে আকুল। কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই তিনি জানেন না, তাঁহার নয়নমনে অনুক্ষণ কৃষ্ণের মূর্তি। তাই তো তিনি বলেন—

গুরুজন—আগে দাঁড়াইতে নারি।
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥
সখীর সহিতে জলেতে যাইতে
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ঝলমল
তাহে কি পরাণ রয়॥

জ্ঞানদাসের পূর্বরাগের রাধার মধ্যেও এই অপরিসীম আর্তি পরিলক্ষিত হয়। কৃষ্ণ জ্ঞানদাসের রাধার নয়নমন অচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেন। কৃষ্ণের রূপের অরণ্যে তিনি হারাইয়া গিয়াছেন। সংসার ও তাঁহার নিজের মধ্যে ব্যবধান অনন্ত বলিয়া মনে হইতেছে—

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ॥

রাধার দেহের প্রতিটি অঙ্গ কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গের পরশ ঐকান্তিক ভাবে কামনা করে। তাঁহার দর্শন এ স্পর্শের কথা ভাবিতেই রাধার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। সেই লজ্জা ঢাকিবার জন্য তিনি কত চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

... ...

দেখিতে যে মুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥



কৃষ্ণের পূর্বরাগের খুব বেশী পদ নাই। আর কৃষ্ণের পূর্বরাগে শুধুমাত্র বয়ঃসন্ধিতে উপনীত রাধিকার দেহের প্রতি আকর্ষণের কথা আছে। রাধার পূর্বরাগে যে-গভীর আকুলতা ও আর্তি পরিলক্ষিত হয় কৃষ্ণের পূর্বরাগে তাহা প্রায় অনুপস্থিত। তবে কৃষ্ণের রূপমুগ্ধতাও বৈষ্ণব কবিরা মনোহর ভঙ্গীতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা রাধাকে দেখিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, রাধার বরতনু হইতে বিদ্যুৎ চমকায়, তিনি যখন হাঁটিয়া যান তখন মনে হয় যেন তাঁহার পদযুগল হইতে স্থলপদ্ম খসিয়া পড়িতেছে। এই সুন্দরী নারী আমার জীবন লইয়া খেলা করিতেছে।

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই।
দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি।
আমারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥

আরেকটি পদে গোবিন্দদাস রাধার প্রতি কৃষ্ণের স্নেহানুরাগ সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রখর সূর্যকিরণে উত্তপ্ত যমুনাসৈকত দিয়া রাধা যাইতেছেন। তাহাতে রাধার কষ্ট হইতেছে ভাবিয়া কৃষ্ণ মনে মনে নিজের চক্ষু দুটিকে পাদুকা-রূপে কল্পনা করিতেছেন—

কোমল চরণ চলত যতি মন্থর
উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি-পঙ্কজ
দুহুঁ পাদুক করি নেল॥

পূর্বরাগই প্রেমের উত্তুঙ্গ শিখর। প্রেমের সুগভীর পরিণতি এবং পরস্পরের প্রতি প্রবল অনুরাগ এইখানেই পত্রপুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই চণ্ডীদাস বলেন—

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি ॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥

পূর্বরাগে উপলব্ধ প্রেমের মহিমা কি কেউ বলিতে পারে? সেই প্রেম যতই বিশ্লেষণ করা যায় ততই নূতন হইয়া উঠে। তাই কবিবল্লভের (মতান্তরে বিদ্যাপতির) রাধা সেই অপার্থিব অনুরাগ ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতি পথে পরশ না গেল ॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল ॥

এইখানেই পূর্বরাগের চরম পরিণতি।

অভিসার

'অভিসার' কথাটির অর্থ হইতেছে নায়িকার প্রতি অনুরাগ হেতু নায়কের এবং নায়কের প্রতি অনুরাগ হেতু নায়িকার সঙ্কেত স্থানে গমন। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে নায়িকার অভিসারই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে 'অভিসারিকা'-র সংজ্ঞা হইতেছে যে-নায়িকা নিজে অভিসার করে বা নায়ককে অভিসার করায় সেই অভিসারিকা।

অভিসারের সঙ্গে বৈষ্ণবের অধ্যাত্মতত্ত্ব জড়িত রহিয়াছে। অভিসারের সঙ্গে বিপদবরণ, একটা দুর্জয় সাহস এবং দুঃখভোগের ভাবটি ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। কৃষ্ণ গোকুলের কুঞ্জে থাকিয়া, যমুনার তীরে তমালবৃক্ষে বসিয়া বংশীবাদন করিতেছেন। ওই বংশীর ধ্বনি শুনিয়া রাধিকা আকুল হইয়া উঠিয়াছেন, গৃহকর্মে তাঁহার মন নাই—তাঁহার সেই অমোঘ আহ্বান উপেক্ষা করিবার সাধ্য রাধার নাই। 'ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে', তাই রাধা সর্বস্ব ফেলিয়া অভিসারে চলিয়াছেন।

শ্যাম অনুরাগ ভরে রহিতে না পারি ঘরে
চল সখি কৃষ্ণ দরশনে।
দেখিয়া ও চাঁদমুখ পাশরিব সর্বদুখ
শ্যামের ও দুটি রাঙ্গা চরণে।

অভিসারই হইল ভগবৎ অন্বেষণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অহরহ তাঁহার আহ্বান সঙ্কেতরূপে আমাদের কাছে প্রেরণ করিতেছেন ; সংসারের ভোগ বাসনায় আমরা এতই মত্ত হইয়া রহিয়াছি যে, সেই আহ্বান আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে না। কিন্তু মনকে সেই আহ্বানের জন্য প্রস্তুত রাখিতে হইবে এবং সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সেই আহ্বানে সাড়া দিতে হইবে ইহাই তো মানবাত্মার অভিসার। বৈষ্ণবের অভিসার পরমাত্মার

প্রতি জীবাত্মার অভিসার—ইহাই বৈষ্ণব পদাবলীতে পরকীয়ার অভিসাররূপে চিত্রিত হইয়াছে।

অভিসারের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখিতে হইবে, কারণ ভগবানের আহ্বান কখন আসিবে তাহার কোনই স্থিরতা নাই। সেই আহ্বান আসিবামাত্রই সব কিছু ফেলিয়া ছুটিয়া যাইতে হইবে। কাজেই শ্রীমতী অভিসারের দুর্গম পথ অতিক্রম করিবার জন্য সর্বপ্রকার বাধা অতিক্রমের শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। হয়তো বা পিচ্ছিল কর্দমাক্ত পথে তাঁহাকে যাইতে হইবে তাই তিনি কলসীর জল ঢালিয়া পথ পিছল করিয়া অঙ্গুলি চাপিয়া চলা অভ্যাস করিতেছেন। পথে কণ্টক থাকিতে পারে, যখন বাঁশীর আহ্বান আসিবে তখন হয়তো কণ্টকময় পথেই চলিতে হইবে, সেইজন্য আঙ্গিনায় কণ্টক পুঁতিয়া কণ্টকময় পথে তিনি চলা অভ্যাস করিতেছেন। নূপুরের শব্দে পাছে কেহ তাঁহার যাওয়ার কথা জানিয়া ফেলে সেইজন্য তিনি বস্ত্র দ্বারা নূপুর আবৃত করিবার অভ্যাস করিতেছেন। পথের অন্যান্য বিপদ অতিক্রমের কার্যকরী পন্থাও তিনি আয়ত্তে আনিতেছেন—

কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগড়ি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাপি॥ (গোবিন্দদাস)

বর্ষা-রজনীর দুর্গম পথে শ্রীমতী অভিসার করিবেন মনস্থ করিয়াছেন কিন্তু কর্দমময় পথ এবং দারুণ বারিধারা উপেক্ষা করিয়া তিনি কি করিয়া যাইবেন—

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী পার॥ (গোবিন্দ দাস)

উত্তরে রাধা বলিতেছেন কুলমর্যাদারূপ কপাট যখন উদ্ঘাটন করিলাম তখন কাঠের কপাট কি আর আমার অভিসারে বাধা দিতে পারিবে? আত্মসম্মানরূপ সমুদ্র যেখানে হেলায় পার হইলাম সেখানে কি আর সামান্য নদী পার হইতে পারিব না—

কুল মরিয়াদ কপাট উদ্ঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিয়াদ— সিন্ধু সঞে পঙারলু
তাহে কি তটিনী অগাধা॥ (গোবিন্দ দাস)

সত্যই তো? সকল প্রকার বাধা অগ্রাহ্য করিতে না পারিলে তো সেই প্রেমময়ের সঙ্গে মিলন হইবে না। এইজন্যই তো সেই পরম পুরুষের সঙ্গে মিলন সকলের ভাগ্যে ঘটে না—'Straight is the gate, narrow is the way and few there be that find it,' ইহাই অভিসার।)

বৈষ্ণব পদাবলীতে অভিসারকে কেন্দ্র করিয়া বহু উৎকৃষ্ট পদ রচিত হইয়াছে। বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন ঋতুতে, যত প্রকার দুস্তর এবং দুরধিগম্য পন্থা কল্পনা করা যায় কবিরা তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং রাধা কিভাবে সেই সকল বাধা অতিক্রম করিবেন তাহাও বাৎলাইয়া দিয়াছেন। অভিসারের পদাবলীতে বর্ষাভিসারই কবিকল্পনাকে সমধিক আকৃষ্ট করিয়াছে। বর্ষাভিসার, শুধু

বর্ষাভিসারই বা কেন অভিসার বর্ণনায় গোবিন্দদাসের জুড়ি নাই। বর্ষাভিসারে রায়শেখর এবং জ্ঞানদাসও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। রায়শেখর এবং জ্ঞানদাসের রাধাও কুলিশপতনশীল গর্জনমুখর রজনীতে অভিসারে বাহির হন।

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী চমকই।
কুলিশ-পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥
সজনি, আজু দুরদিন ভেল।
হামারি কান্ত নিতান্ত আগুসরি
সঙ্কেত গেল (রায় শেখর)

অথবা,

মেঘ যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার
ঐছে সময়ে ধনি করু অভিসার॥
ঝলকত দামিনী দশ দিশ বাপি।
নীল বসনে ধনি সব তনু ঝাঁপি॥ (জ্ঞানদাস)

যাহার মনে কানুর প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে অর্থাৎ ভগবানের আহ্বান যে শুনিতে পাইয়াছে তাহার তো অভিসারে বাহির না হইয়া উপায় নাই। কোন ভয়, কোন লোকনিন্দা তাহাকে অভিসারের পথ হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারিবে না। তাই রাধা বলেন—

কানু অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর
রহই ন পারই গেহ।
গুরু-দুরুজন-ভয় কিছু নাহি মানয়
চীর নহি সম্বরু দেহ॥

দেখ দেখ অনুরাগরীত।
ঘন আন্ধিয়ার ভুজগভয় শত শত
তবু নাহি মানয়ে ভীত॥ (জ্ঞানদাস)

এই দুরধিগম্য পথ অতিক্রমের পর অমৃত লাভ হয়। শ্রীমতী যখন দুস্তর পথ অতিক্রম করিয়া কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন তখন কৃষ্ণ অগ্রসর হইয়া শ্রীমতীকে বুকে টানিয়া লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সকল দুঃখ দূর হইল এবং অভিসারের জন্য অকল্পনীয় কৃচ্ছ্র সাধন সার্থক হইল।

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ কর-কমলে চরণ-যুগ মোছই
হেরইতে চির থির আঁখি॥
পিরীতি মুরতি অধিদেবা।
যাকর দরশনে সব দুখ মিটল
সোই আপনে করু সেবা॥ (গোবিন্দদাস)

কৃষ্ণের বুকে মাথা রাখিয়া শ্রীমতী তাঁহার অভিসারের দুঃখ কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন—

মন্দির তেজি যব পদ চার আওলুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ॥

আরও কত প্রাণঘাতিনী বিঘ্নরাশি এবং বৈরীদল শ্রীমতীর পথরোধ করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু কৃষ্ণের বাঁশীর শব্দ যে শুনিয়াছে সে কি নিজের প্রাণের কোন মায়া রাখে! তাই তো শ্রীমতী বলেন—

একে পদ-পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টক জর জর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ
চির দুখ অব দূরে গেল॥
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশিল
ছোড়লু গৃহ-সুখ-আশ।
পন্থক দুখ তৃণ হুঁ করি না গণলুঁ
কহতাঁহি গোবিন্দদাস॥

ইহাই অভিসারের মূল কথা। সর্ব বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া ভগবানের আহ্বানে সাড়া দিলে পরিণামে তিনি ভক্তকে বুকে টানিয়া নেন। তখন সর্বদুঃখ, সর্বতাপ দূর হইয়া যায়।

এই অভিসার একমুখী নহে। কৃষ্ণও সাগ্রহে রাধার জন্য অপেক্ষা করেন। কারণ ভক্তকে না হইলে ভগবানের চলে না। তাই দুর্যোগময়ী রজনীর বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া কৃষ্ণও রাধার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকেন।

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
সই কি আর বলিব তোরে।
কোন পুণ্য ফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে॥ (চণ্ডীদাস)

ঘনান্ধকার বাত্যাবিক্ষুব্ধ রজনীতে অভিসারের পদ অধিক থাকিলেও অন্যান্য ঋতুতে অভিসারের কথাও দেখিতে পাওয়া যায়।

যেমন গ্রীষ্মের দুপুর বেলার অভিসার—

মাথহিঁ তপন তপত পথ বালুক
আতপ দহন বিথার।
মনিক পুতলী তনু চরণ-কমল জনু
দিনহি কয়ল অভিসার॥

শীতের রাতে—

পৌখলি রজনি পবন বহে মন্দ।
চৌদিশে হিম হিমকর বন্ধ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নয়ন রহুঁ ঝাঁপ॥

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, অভিসার পদাবলীতে গোবিন্দ দাস নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। কুমারসম্ভবে গৌরী মহেশকে লাভ করিবার জন্য যে-দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন গোবিন্দদাসের রাধার মধ্যে সেই ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্রজবুলির মিঠে সুরের সঙ্গে কাব্যধ্বনি এত চমৎকারভাবে মিশিয়া গিয়াছে যাহাতে তাঁহার পদগুলি পাঠ করিলেই পাঠকের মনে এক গভীর আর্তি সঞ্চারিত হইয়া যায়। তদুপরি গোবিন্দদাস ছিলেন ভাবগম্ভীর কবি। তাঁহার অভিসারের পদসমূহে গাম্ভীর্যের সঙ্গে বৈষ্ণব তত্ত্বটি স্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

অনেকে মনে করেন বৈষ্ণব পদাবলীতে মাথুর ও অভিসারের পদই শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিতে পারে। কথাটি সর্বাংশে সত্য। পৃথিবীর সর্বত্রই নদীর সমুদ্রাভিমুখে চলার মতই নিত্য অভিসার সঙ্গীত গীত হইয়া উঠিতেছে। এই অভিসারের সঙ্গে যে নিজের আত্মাকে যুক্ত করিয়া দিতে পারে তাহারই জীবন সার্থক—

যে অভিসারিকা তারই জয়।
আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে।

সেও ত নেই স্থির হ'য়ে যে পরিপূর্ণ।
সে যে বাজায় বাঁশী। প্রতীক্ষার বাঁশী,
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা—
পদে পদে মিলেছে এক তানে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে,
সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে। (রবীন্দ্রনাথ)

মান ও কলহান্তরিতা

প্রতিনায়িকার নিকট রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে আগত নায়ককে দেখিয়া নায়িকা রুষ্টা হইয়াছেন এবং তাঁহার নিদারুণ মান হইয়াছে। এই মানের বশবর্তিনী হইয়া তিনি নায়ককে হারাইয়াছেন। হারাইয়া কিন্তু তাঁহার মনে অনুতাপ আসিয়াছে। এইরূপ অনুতপ্তা নায়িকাকে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে কলহান্তরিতা বলা হইয়া থাকে।

রাধাকে মানিনী হইতে দেখিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে মান ভাঙ্গিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এমন কি শ্রীমতীর পায়ে ধরিয়া তাঁহার দুর্জয় মান দূর করিবার প্রয়াস পাইলেন।

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান-নাচনে নাচে হিয়ার পুতলী॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিঃশ্বাসে॥
রাই কত পরখসি মোরে আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার॥ (জ্ঞানদাস)

রাধা কৃষ্ণেরই আনন্দাংশের সারভূতা মানবীরূপ। কাজেই রাধা ক্ষুব্ধ হইয়া থাকিলে কৃষ্ণের লীলা চলে না। আর মানিনী রাই-এর মান ভাঙ্গানও তো লীলারই অঙ্গ।

কৃষ্ণের বিস্তর সাধাসাধিতেও মানিনীর মান ভাঙ্গিল না। তিনি বলিলেন, যে-নারীর সঙ্গে রাত্রিযাপন করিয়াছ তাহার চরণ সেবা করিতে যাও। কেন আমাকে বৃথা কাঁদাইতে আসিয়াছ? যে নারীর অলক্ত চিহ্ন তোমার অঙ্গে শোভা পাইতেছে তাহার সঙ্গে গিয়া আবার প্রেম-লীলা কর। আমার মত সরলা নারীর নিকট আসিয়া কোন ফল নাই। তোমার মত কুটিল ব্যক্তির সহিত কুটিল নারীরই ঠিক মিল হইবে।

মাধব, কাহে কান্দাওসি হামে।
চল চল সে ধনি-ঠামে॥
তুঁহারি হৃদয়-অধিদেবী।
তাক চরণ যাউ সেবি॥
যো যাবক তুয় অঙ্গ।
ততই করহ পুন রঙ্গ॥
মোই পূরব তুয় কাম।
কি ফল মুগুধিনী-ঠাম॥
এত কহু গদগদ ভাষ।
ভণ রাধামোহন দাস॥

অনেক প্রকারে অনুনয়বিনয় করিয়াও কৃষ্ণ রাধার মান ভাঙ্গাইতে পারিলেন না। তিনি নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন। রাধার মনে অনুতাপ উপস্থিত হইল। অনুতপ্তা রাধাকে লক্ষ্য করিয়া সখী বলিল—মান ভঙ্গ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তোর পায়ে ধরিতে আসিলে তুই কেমন করিয়া সেই করপল্লব পায়ে ঠেলিয়া দিলি। সারাজীবন ধরিয়া তোকে ইহার জন্য অনুতাপ করিতে হইবে। অনুতপ্তা রাধা বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ

যে, বিশ্ববাসী সকলেরই হৃদয়-বল্লভ এই কথা বুঝিতে না পারিয়া আমি একা তাঁহার আদরিণী হইব এই অভিলাষ করিয়া তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া দিবারাত্রি প্রাণের জ্বালায় মরিতেছি।

আন্ধল প্রেম পহলি নহি জানলুঁ
সো বহুবল্লভ কান।
আদর-সাধে বাদ করি তামঞে
অহর্নিশি জ্বলত পরাণ॥ (গোবিন্দদাস)

সখী বলিলেন—কুলবতী হইয়া কেহ যেন পরপুরুষের প্রতি না চায়। আর যদিই বা চায় তো শ্রীকৃষ্ণের পানে যেন না তাকায়; আর যদি শ্রীকৃষ্ণের পানে চায় তবে যেন তাঁহার সঙ্গে প্রেম করিতে অগ্রসর না হয়; আর যদি প্রেমই করে তবে সেই প্রেমের মধ্যে যেন মানের স্পর্শ না থাকে।

এমন সময় শ্রীকৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া রাধা তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া বিমুখ হইয়া বসিয়া রহিলেন। নারী হইয়া পুরুষের নিকট দুর্বলতা প্রকাশ করিতে রাধার সম্ভ্রমে বাঁধিল। সখী রাধার মতলব বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণকে রাধার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতে ইঙ্গিত করিলেন, কৃষ্ণ তাহাই করিলেন। রাধা মান ত্যাগ করিলেন এবং—

সুবাসিত বারি ঝারি ভরি তৈখনে
আনল রসবতী রাই।
দুখানি চরণ পাখানিয়ে সুন্দরী
আপন কেশেতে মোছাই॥
অঙ্গক ধূলি বসনহি ঝাড়ই
অনিমিখি হেরই বয়ান।
তুহু মনে মনে করলু বর মাধব
হমে অতি অলপ-পরাণ॥ (গোবিন্দদাস)

রাধা বলিলেন—হে মাধব, তুমিই আমার গর্ব বাড়াইয়া দিয়াছ এবং সেই অহঙ্কারে মত্ত হইয়াই আমি তোমার উপর অভিমান করিয়াছিলাম। দুইজন দুইজনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, আনন্দে উভয়ের অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। মান-লীলা শেষ হইল।

দুহুঁ মুখ-দরশনে দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ-লোর॥
দুহুঁ তনু পুলকিত গদ গদ ভাষ।
ঈষদবলোকনে লহু লহু হাস।
অপরূপ রাধা-মাধব-রঙ্গ।
মান-বিরামে ভেল এক সঙ্গ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দ মগন ভেল দেখি দুহুঁ জন॥ (নরোত্তম দাস)

প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ

হৃদয়ে গভীর প্রেম বিদ্যমান থাকিলে প্রিয়তমকে কাছে পাইয়াও যেন মনে হয় তাহাকে এই বুঝি হারাইলাম। প্রিয় সান্নিকর্ষে থাকিয়াও বিরহবোধ-জনিত যে-বেদনা তাহারই আস্বাদযোগ্য অবস্থার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য। এই প্রেমবৈচিত্ত্যই আক্ষেপানুরাগ। নিভৃত কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণকে বাহুবন্ধনের মধ্যে পাইয়াও শ্রীরাধা দারুণ বিরহে কাতর হইয়া কানু কানু করিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইতেছেন।

নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
কুঞ্জে শুতলি ভুজ পাশে।
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরী
দারুণ বিরহ-হুতাশে॥ (গোবিন্দদাস)

শ্রীমতীর সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁহার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সর্বদাই কানু তাঁহার অনুভবের বিষয় হইয়া আছে।

যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানু পথে ধায় রে॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥ (চণ্ডীদাস)

তাই রাধা এই কামনা করিতেছেন যে, পরজন্মে তিনি যেন নন্দের নন্দন কৃষ্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণ যেন রাধা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাহা হইলে কৃষ্ণ এখন যেমন তাঁহাকে কাঁদাইতেছেন তিনিও তেমনি রাধারূপী কৃষ্ণকে কাঁদাইবেন।

বঁধু, কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে॥
কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা॥
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা॥ (চণ্ডীদাস)

কৃষ্ণপ্রেমে রাধা আকুল। যতই তিনি সেই প্রেমের স্বরূপ বুঝিতে চাহেন ততই সেই প্রেমের রহস্য আরও ঘনীভূত হইয়া উঠে।

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাই তোমা হেন॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি। (চণ্ডীদাস)

কৃষ্ণপ্রেমে যে মজিয়াছে তাহার জীবন দুঃখপূর্ণ। কারণ খাইতে বসিতে তাহার স্বস্তি নাই। এই দুঃখে সান্ত্বনা দিবারও কেহ নাই। বরং উল্টা সকলেই গঞ্জনা করে। তাই রাধা গরল ভক্ষণ করিয়া এই জীবন ত্যাগ করিবেন স্থির করিয়াছেন।

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন জন নাই॥
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে॥ (চণ্ডীদাস)

কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হইয়া রাধা ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি সুখী হইবেন। কিন্তু এখন দেখিতেছেন এই প্রেমের জ্বালা দুর্নিবার। তাই তো তিনি আক্ষেপ করিয়া বলেন—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি॥ (জ্ঞানদাস)

আক্ষেপানুরাগের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস। তাঁহার ভাবশিষ্য জ্ঞানদাসও আক্ষেপানুরাগের পদে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আক্ষেপানুরাগে চণ্ডীদাস রাধার যে-মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা ভগবতপ্রেমে বিভোর মানবাত্মার স্বরূপকে আমাদের নিকট উন্মোচিত করিয়া দেয়। তাঁহার রাধার করুণ বিলাপের মধ্যে ভগবতপ্রেমে দীর্ণ মানবাত্মার আর্তনাদ শোনা যায়। সেই মানবাত্মা, 'নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে'।

বিরহ, মাথুর ও প্রবাস

বিরহ প্রেমেরই অঙ্গ। বিরহই মিলনের আনন্দকে পূর্ণ করিয়া তোলে। মধুর রসই বৈষ্ণব সাহিত্যে চরম আস্বাদ্য। মধুর রসকে দুইটি ভাগে (ক) মিলনের পূর্বাবস্থা—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস বা বিরহ (এক কথায় বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার) (খ) মিলন বা সম্ভোগাত্মক শৃঙ্গার এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের মধ্যে বিরহ বা মাথুর বা প্রবাসই সর্বাপেক্ষা অধিক উপভোগ্য। কারণ বিরহের পদগুলিতে সাধারণত কবিহৃদয়ের আবেগের সহিত ভক্ত বৈষ্ণবের প্রগাঢ় আর্তি মিলিয়া এই পদগুলি অনুপম মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। 'শ্রীরাধা লৌকিক নায়িকা নহেন, বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে তিনি হ্লাদিনী শক্তি, মহাভাবস্বরূপা, শ্রেষ্ঠ ভক্তের পরম সীমা। কাজেই শ্রীরাধার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ কৃষ্ণপ্রেমের সর্বোৎকৃষ্ট মুহূর্তে। নিবাত রুদ্ধগৃহে যখন শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে তখনই বোঝা যায় বাতাসের মূল্য। মূল্যহীন জলের অমূল্যতা বোঝা যায় মরুভূমির মধ্যে। শ্রীকৃষ্ণ যে, রাধার পক্ষে কি ছিলেন, তাহা বিরহ ছাড়া বুঝিবার উপায় কি? বিরহ প্রেমের নিকষ পাথর।'

কংসকে দমন করিবার জন্য কৃষ্ণ মথুরায় গেলেন। কৃষ্ণের এই প্রবাসকে উপলক্ষ করিয়া মাথুরের (বিরহ বা প্রবাসের) পদগুলি রচিত হইয়াছে। বিরহ ও মাথুর একার্থক হইলেও ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যটি লক্ষণীয়। কলহান্তরিতা রাধাও পরিশেষে কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই বিরহ বা ব্যাকুলতা মাথুর-বিরহের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কৃষ্ণের মথুরা গমনজনিত দুঃখ হইতে রাধার যে-বিরহ তাহাই মাথুর, বাকী হইল শুধু বিরহ। বিরহ ও মাথুর বিপ্রলম্ভ-প্রবাসের অন্তর্গত।

অক্রূর আসিয়া কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গেল। ঐ ব্যক্তি নামেই শুধু অক্রূর আসলে ইহার মত ক্রূর বা নিষ্ঠুর ব্যক্তি আর নাই। সে

ঘরে ঘরে ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছে যে, আগামীকালই মথুরায় যাইতে হইবে।

নামহি অক্রূর ক্রূর নাহি যা সম
সো যাওল ব্রজ মাঝ।
ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ-অমঙ্গল
কালি কালিহুঁ সাজ॥ (গোবিন্দ দাস)

সুরু হইল বিরহের বেদনা। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য সখীরা চম্পকের মালা বানাইতেছে। কিন্তু তাহার আর কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবার কথা তিনি ব্রজপুর অন্ধকার করিয়া চলিয়া যাইতেছেন—

কিয়ে সখি চম্পক— দাম বনায়সি
করইতে রভস-বিহার।
সো বর নাগর যাওব মধুপুর
ব্রজপুর করি আন্ধিয়ার॥ (যদুনন্দন)

গোকুল অন্ধকার হইয়া গেল। এখন এখানে শুধু নয়নজলের ধারা বহিতেছে। মন্দির শূন্য, দশদিক শূন্য। রাধা কোন্ সুখে যমুনার তীরে যাইবেন, কি করিয়াই বা কুঞ্জের দিকে তাকাইবেন?

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কো হরি নেল॥
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়ন-জলে দেখ বহয়ে হিলোল॥
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি॥
কৈছনে যায়ব যমুনা-তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর॥ (বিদ্যাপতি)

রাধা শোক করিতেছেন—যাঁহার সঙ্গে মিলনে পাছে এতটুকুও বাধা হয় এই আশঙ্কায় আমি বক্ষে বস্ত্র, চন্দন বা হার পরিতাম না, সেই প্রিয় এখন নদী ও পর্বতের ব্যবধানে গিয়াছেন। যে প্রিয়ের গর্বে আমি কাহাকেও গ্রাহ্য করি নাই সেই প্রিয়ের অনুপস্থিতিতে কেই বা কি না বলিতেছে।

চির চন্দন উরে হার না দেলা।
সো যব নদী-গিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কে কি না কহলা॥ (বিদ্যাপতি)

পরিপূর্ণ বর্ষাকাল আর রাধার মন্দির শূন্য। তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, কারণ প্রিয় তাঁহার নিকটে নাই। কুলিশপাত দ্বারা আনন্দিত হইয়া ময়ূর মত্ত হইয়া নাচিতেছে। ভেক ডাকিতেছে, ডাহুক ডাকিতেছে আর প্রবাসী কান্তের বিহনে নিষ্ঠুর কামদেব রাধার বক্ষে সঘনে তীক্ষ্ণ শর হানিতেছে।

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গর জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥ (বিদ্যাপতি)

অদৃষ্টদোষে রাধার বেলায় সবই বিপরীত হইল। প্রেমিক প্রেমিকাকে প্রেমদানে বঞ্চিত করিবে ইহা ত সৃষ্টির নিয়ম নয়। কে কবে শুনিয়াছে—

কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব
মাধবী মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু-পিরীতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি-নিরমাণ॥ (বিদ্যাপতি)

কৃষ্ণ শীঘ্রই আসিবেন ইহাতে শ্রীমতী সান্ত্বনা পাইতেছেন না। কারণ অঙ্কুর সৃষ্ট হইতেই যদি রবি-তাপে পুড়িয়া যায় তবে পরে জলপূর্ণ মেঘ আর কি করিবে?—

অঙ্কুর তপন— তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া-লেহে॥ (বিদ্যাপতি)

কৃষ্ণ-বিরহে শ্রীমতীর বাঁচিয়া থাকা হইবে না। কিন্তু তাঁহার একটি সাধ আছে। সখীরা যেন তাহা পূর্ণ করে—

রোপিনু মল্লিকা নিজ করে।
গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে॥ (শেখর)

শ্রীমতীর মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু মৃত্যুর পরেও তিনি কৃষ্ণের সেবায় লাগিতে চাহেন। তিনি কামনা করিলেন তাঁহার দেহের যে-অংশ মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া যাইবে, তাহা যেন সেই স্থানের মৃত্তিকায় পরিণত হয়,—যে-স্থান দিয়া কৃষ্ণ প্রতিদিন গমনাগমন করেন—

যাঁহা পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥ (গোবিন্দ দাস)

মানবাত্মার এক সুগভীর আর্তি এই মাথুর-বিরহের পদগুলিতে রূপলাভ করিয়া পদাবলী সাহিত্যে এই পদগুলিকে শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

ভাবসম্মিলন, মিলন ও ভাবোল্লাস

রাধা ও কৃষ্ণের যে-দেহজাত সম্ভোগ তাহা বস্তু-জগতের মিলন মাত্র। কাজেই এই মিলন সর্বদাই বিরহস্পৃষ্ট। কিন্তু ভাব-জগতের মিলন হইতেছে ভাবলোকে, হৃদয়ের অন্তস্তলে। হৃদয়ের গভীর প্রদেশে যখন মিলনের এই অনুভূতি জাগে তখন দুহুঁর কোলে দুইজন বিচ্ছেদ ভাবিয়া কাঁদেন না। রাধা তখন প্রশ্ন করেন—'এ হিয়া হৈতে বাহির হইয়া কেমনে আছিলে তুমি'।

বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরা যাইবার সময় কৃষ্ণ শ্রীমতীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাই একদিকে কৃষ্ণবাক্য ও অন্যদিকে কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর অমোঘ আকর্ষণ ব্যর্থ হয় বলিয়া এই ভাব-সম্মিলনের মধ্যে তাহার পূরণ হইয়াছে। ভাব-সম্মিলনও সম্ভোগ কিন্তু তাহা বাহিরের সম্ভোগ নহে—ভাবের সম্মিলন। ভাব-সম্মিলন বা ভাবোল্লাসের মধ্যে মিলনের ভাবটি রহিয়াছে নিঃসন্দেহে। সাধারণ মিলনে বিরহের আশঙ্কাটি সর্বদাই বিদ্যমান থাকে কিন্তু ভাব-সম্মিলনে বিচ্ছেদের ভাবনা নাই। কারণ ভাবজগৎ আর বস্তুজগৎ এক নহে।

ভাব-সম্মিলনে যেমন বৃন্দাবন-মথুরার পার্থক্য নাই তেমনি রূপগত বিরহ-মিলনের আনন্দবেদনা নাই। দীর্ঘকাল বিরহবেদনা ভোগ করিবার পর শ্রীমতীর মানস-বৃন্দাবনে আবার শ্রীকৃষ্ণের দর্শন মিলিল। তাই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তিনি বলিতেছেন—

সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল॥

কাজেই প্রিয়তমকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শ্রীমতী নিজের দেহকেই অর্ঘ্য সাজাইতেছেন—

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥

বাঞ্ছিতকে লাভ করিয়া শ্রীমতীর আর আনন্দের অবধি নাই। তাই তিনি উল্লসিত হইয়া বলিতেছেন—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥

হৃদয়ের ভাবরাজ্যে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া শ্রীমতী জানিয়াছেন যে, আর তাঁহাকে হারাইতে হইবে না। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি বলেন—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

'আর এ মন্দির আছে মানস-বৃন্দাবনে ভাবলোকে। বাহিরে যাঁহারা রাধা ও কৃষ্ণ এই দুই দেহে বিদ্যমান মিলন-বিরহের খণ্ডপথে যাত্রী, ভাবলোকে তাঁহারাই একস্থ; একাত্ম, অদ্বৈত সম্মিলনে অখণ্ড ও পূর্ণ। 'ভাব-সম্মিলন' বাহির হইতে আবার হিয়ার ভিতরে ফিরিয়া যাওয়া, রূপকে ভাবের মধ্যে, খণ্ডকে অখণ্ডের মধ্যে, দ্বৈতকে অদ্বৈত ঐক্যে ফিরিয়া পাওয়া'।

নিবেদন ও প্রার্থনা

বৈষ্ণব পদাবলীর নিবেদন ও প্রার্থনা বিষয়ক পদগুলির মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। শুধু প্রার্থনার পদগুলির মধ্যে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব পরিলক্ষিত হয়। নিবেদনের পদগুলিতে আত্মনিবেদনের ভাব থাকিলেও এখানে কৃষ্ণ সখা। নিবেদনের পদে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

চণ্ডীদাসের রাধা জীবনে-মরণে, জন্ম-জন্মান্তরে কৃষ্ণকেই প্রাণনাথ রূপে কামনা করেন। কৃষ্ণ ছাড়া পিতৃকুল ও স্বামিকুল এবং সমগ্র গোকুলে অর্থাৎ ত্রিসংসারে তাঁহার আর কেউ নাই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি॥
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥

তাই তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, প্রাণনাথ বিনা তাঁহার আর গতি নাই এবং এই জন্যই—

দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান॥

জ্ঞানদাসের রাধা ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন—

বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটি চরণ
সদা লইয়া রাখি বুকে॥

এই সমস্ত পদে আত্ম-নিবেদনের ভাবটি বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

প্রার্থনার পদে বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদগুলিতে এক সার্বভৌম ধর্ম-নিরপেক্ষ আবেদন সুস্পষ্ট। বিদ্যাপতি যখন তিল-তুলসীদ্বারা আপন দেহ কৃষ্ণপদে অর্পণ করিয়া বলেন—

গণইতে দোষ গুণ-লেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার॥

তখন ইহা অনিবার্যভাবেই আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদে ভগবানের সর্বশক্তিমান রূপটিও অতি সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি' পুন তোহে সমাওত,
সাগর-লহরী সমানা॥

নরোত্তম দাসের প্রার্থনা বিষয়ক একটি পদে বৈষ্ণব তত্ত্বের প্রকাশ লক্ষণীয়—

হরি হরি, হেন দিন হইবে আমার।
দুহুঁ-অঙ্গ পরশিব দুহুঁ-অঙ্গ নিরখিব
সেবন করিব দোঁহাকার॥

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস

বিদ্যাপতি প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি। তিনি আনুমানিক ১৩৮০—১৪৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে মিথিলার রাজসভার কবি ছিলেন। বৈষ্ণব পদ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে (বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা দ্রষ্টব্য) কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব ও শাক্তনির্বিশেষে বহু দেবদেবীরই উপাসনা করিতেন। দীর্ঘকাল রাজসভার সঙ্গে যুক্ত থাকায় বিদ্যাপতির বাস্তবজ্ঞান ও বিষয়বুদ্ধি বিশেষ ক্ষুরধার হইয়াছিল। বিদ্যাপতি নানা শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন, বিশেষ করিয়া সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলী আলোচনা করিবার পূর্বে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব তত্ত্ব তাঁহার কাব্যে প্রতিফলিত হয় নাই এবং তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে মানবিক প্রেমকাহিনীরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন। বলিতে পারা যায় যে, তাঁহারই পদের অনুসরণে পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদাবলীর স্তরবিন্যাসটি পরিকল্পিত হয়।

বিদ্যাপতির পদাবলীর মানবিক আবেদনের দিকটিই বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি যে-উন্নত জীবনচর্চার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং রাজসভায় দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার ফলে যে-বিদগ্ধ রস ও রুচির অধিকারী হইয়াছিলেন তাঁহার রচিত পদে তিনি তাহাদের সার্থক প্রয়োগ করেন। বিদ্যাপতির রাধাচরিত্রের পরিকল্পনায় তাঁহার অপূর্ব কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নবোদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরীর বয়ঃসন্ধি বর্ণনা করিয়া যেভাবে তিনি আস্তে আস্তে তাঁহাকে 'খরদীপ্তিময়ী' নায়িকায় পরিণত করিয়াছেন তাহা সকলের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। চঞ্চলা কিশোরীকে সুচতুরা নায়িকায় পরিণত করিবার মধ্যে বিদ্যাপতির অপূর্ব চরিত্রাঙ্কণ

দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির রাধা যে, কত চতুর তাহা তাঁহার বিভিন্ন পদে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। রাধা গুরুজনদের সঙ্গে স্নানের জন্য যমুনায় গিয়াছিলেন। গৃহে ফিরিবার সময় দেখেন যে, কৃষ্ণ কদম্বমূলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণের দিকে তাকাইবার উপায় নাই গুরুজনরা রহিয়াছেন। তাই তিনি এক বুদ্ধি স্থির করিলেন—

তঁহি পুন মোতি-হার তোড়ি ফেকল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম-দরশ ধনি লেল॥

গলার মতির হার তিনি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। সকলে এখান সেখান হইতে মুক্তা কুড়াইতে লাগিল। রাধা সেই ফাঁকে কৃষ্ণকে দেখিয়া লইলেন।

ভীরু বালিকা রাধাকে আস্তে আস্তে কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা করিয়া অভিসারের পথে অগ্রসর করিয়া পরিণামে মিলনোল্লাসের মধ্যে মগ্ন করিয়া দেওয়া—এই সমগ্র পর্যায়টি শুধুই যে, কাব্যশ্রী মণ্ডিত এমন নয়, ইহার তীব্র নাটকীয় গতিটিও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। বিদ্যাপতির 'রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য ঢলঢল করিতেছে। শ্যামের সহিত দেখা হয় এবং চারিদিকে একটা যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। খানিকটা হাসি, খানিকটা ছলনা, খানিকটা আড়-চক্ষে দৃষ্টি। * * রাধা নবীনা, নবস্ফুটা। আপনাকে এবং পরকে ভালো করিয়া জানে না। দূরে সহাস্য সতৃষ্ণ লীলাময়ী, নিকটে কম্পিত শঙ্কিত বিহ্বল। কেবল একবার কৌতূহলে চম্পক অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে। * * যৌবন, সেও সবে

আরম্ভ হইয়াছে, তখন সকলই রহস্য পরিপূর্ণ। সগুবিকচ হৃদয় সহসা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে; আপনার সম্বন্ধে আপনি সবেমাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে; তাই লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না—

কবহুঁ বাঁধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি।
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি॥

হৃদয়ের নবীন বাসনাসকল পাখা মেলিয়া উঠিতে চায়, কিন্তু এখনো পথ জানে নাই। কৌতূহল এবং অনভিজ্ঞতায় সে একবার ঈষৎ অগ্রসর হয়, আবার জড়সড় অঞ্চলটির অন্তরালে আপনার নিভৃত কোমল কুলায়ের মধ্যে ফিরিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।' (রবীন্দ্রনাথ)

কিন্তু ক্রমশঃই শ্যামরূপ রাধার অন্তরকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। তখন রাধা কৃষ্ণকে—

হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি॥

বলিয়া জানিয়াও বুঝিতে পারিলেন না কৃষ্ণের স্বরূপ কি? তাই তিনি শুধান 'তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।' কারণ—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥

অতঃপর শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য অভিসার। 'আর এই অভিসারকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি দুর্গম পথের সমস্ত বাধা, বর্ষার দুর্যোগময়ী প্রকৃতি, বজ্র ও বিদ্যুতের হানাহানি, বনপথের আঁধারে মগ্ন পিচ্ছিলতা প্রভৃতি বর্ণনার অবসর পাইয়াছেন ও ইহাতে সাধনের দুরূহতার ইঙ্গিত দিয়াছেন। বিরহপর্যায়ের পদে বিদ্যাপতি উদার আত্মবিসর্জন ও গভীর নিঃস্বার্থ ভালবাসার নূতন সুর লাগাইয়াছেন। * * বিদ্যাপতির পদে আলঙ্কারিক প্রথার সঙ্গে ক্ষমাস্নিগ্ধ, আত্মসংযমপূত মনোভাবের মিলন দেখা যায়। বিশেষতঃ মাথুর বিরহের পদগুলিতে আর্তির যে-করুণ রস, প্রেমাস্পদকে সম্পূর্ণ মার্জনা করিয়া নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য দৈব ও কর্মফলকে দায়ী করার যে প্রবণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার উদারতা ও মাধুর্য উহাদের ভাবোৎকর্ষের কারণ। ভাবসম্মিলনের পদগুলিও বিদ্যাপতির উন্নত ভাব-কল্পনার পরিচয়। তিনি কোনও পুরাণ অনুসরণ না করিয়া কেবল নিজ কবিমনের সহজ অনুভূতির জন্য রাধাকৃষ্ণের বিরহের পর পুনর্মিলন ঘটাইয়াছেন ; এই পদগুলিতে মিলনের নিবিড় আনন্দ উছলিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতি ধর্মবিশ্বাসে ঠিক বৈষ্ণব ছিলেন না ; চৈতন্য-পূর্ববর্তী বলিয়া শ্রীচৈতন্যের অনুভূতিতে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা যে-রসমাধুর্য ও ধর্মসাধনারূপে স্ফুরিত হইয়াছিল তাহা তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল। তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চৈতন্যধর্মতত্ত্ব না জানিয়াও তিনি ভক্তি ও কবিচিত্তের সংস্কারের বলেই বহুপদে বৈষ্ণবধর্মের ভবিষ্যৎ পরিণতির পূর্বাভাস দিয়াছেন।' (ডাঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়)। কিন্তু বিদ্যাপতির রাধার অভিসারে দৈহিক মিলনের আকাঙ্ক্ষাই প্রবল। ইহার মধ্যে কোন তাত্ত্বিক তাৎপর্য নাই। তবুও মাথুরবিরহে বিদ্যাপতির রাধা যখন বলেন—

(ক) এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর॥

(খ) অঙ্কুর তপন— তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে॥

তখন যে-করুণ আর্তি ফুটিয়া উঠে তাহা আমাদিগকে কৃষ্ণবিরহে চৈতন্যদেবের চিত্তদীর্ণ হাহাকারের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

আবার ভাবসম্মিলনের পদে শ্রীমতী যখন মিলনের আনন্দে,—

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥

করিতে চাহেন এবং আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলেন—

(ক) আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥

(খ) কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

তখন এই উল্লাসকেও আমাদের অপার্থিব উল্লাস বলিয়া মনে হয় যাহা চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীতেই সম্ভব। কিন্তু তবু মনে রাখিতে হইবে যে, বিদ্যাপতির পদাবলীতে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ স্বেচ্ছাকৃত নয় ইহা নিতান্তই আকস্মিক। কারণ বিদ্যাপতি সাধক ছিলেন না তিনি ছিলেন কবি। লোকোত্তর প্রতিভাসম্পন্ন কবি ছিলেন বলিয়াই তিনি লৌকিক জগতের কামনাকে অলৌকিক জগতের বস্তু করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির প্রার্থনা-বিষয়ক পদগুলিতে এক সর্বজনীন ভগবদোপলব্ধির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার—

(ক) মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়।
(খ) কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর-লহরী সমানা॥

প্রভৃতি পদগুলিতে মানবাত্মার যে-গভীর আকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার আবেদন কখনও লুপ্ত হইবার নহে।

বিদ্যাপতির পদগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার কবিকৃতি সম্পর্কে এই কথা কয়টি মনে জাগে—

(১) তাঁহার মননশীলতা ও মার্জিত বাচনভঙ্গী যাহা তাঁহার আলঙ্কারিকতায় ও রূপনির্মিতিতে প্রকাশ পাইয়াছে।

(২) তাঁহার কাব্যের মানবিক আবেদন—ইন্দ্রিয়প্রধান দেহ বর্ণনায় এবং নায়িকার চরিত্রচিত্রণে যাহার প্রকাশ।

(৩) নায়িকার চরিত্রচিত্রণে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা।

(৪) ইন্দ্রিয়সর্বস্ব জগৎ হইতে পরিণামে ইন্দ্রিয়াতীত জগতে উপনীত হওয়া—বয়ঃসন্ধির রাধা এবং তৎপরবর্তী অবস্থার রাধার বর্ণনায় যাহার প্রকাশ।

** **গোবিন্দদাস**—ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকের কবি। ইঁহার নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায় বুধরি গ্রামে। ইনি সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার পদে ছন্দ, অলঙ্কার ও পদবিন্যাসের বৈচিত্র্য একক ও তুলনা রহিত। গৌরচন্দ্রিকা, পূর্বরাগ, মাথুর ও অভিসারের পদে গোবিন্দদাস সবিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের কবিতাগুলি প্রাণের আবেগে সমুজ্জ্বল। গোবিন্দদাস

নিজে ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন কিন্তু তাঁহার কবিত্বশক্তি এত অসাধারণ ছিল যে, তিনি ভক্তজনোচিত ভাবাকুলতা সংবরণ করিতে জানিতেন। গোবিন্দদাস যে-সমস্ত অলঙ্কারের প্রয়োগ করিয়াছেন তন্মধ্যে রূপক ও উপমার বৈচিত্র্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

গৌরচন্দ্রিকা তথা গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদে গোবিন্দদাস যেন মহাপ্রভুর প্রেমঘন মূর্তিটিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

(ক) নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর॥

(খ) পতিত হেরিয়া কাঁদে স্থির নাহি বাঁধে
করুণ নয়নে চায়।
নিরুপম হেম জিনি উজোর গোরা-তনু
অবনী ঘন পড়ি যায়॥

এই সকল পদের মধ্য দিয়া প্রেমের অবতার দিব্যকান্তি গৌরাঙ্গ-দেবকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি।

পূর্বরাগের—

(ক) ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি

(খ) যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি

(গ) রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি

প্রেমবৈচিত্ত্যের—

(ক) নাগর-সঙ্গে রঙ্গে যবে বিলসই

পারিবে, সে ততই ধনী বলিয়া খ্যাত হইবে, যখন হৃদয়ের দ্বার দিবারাত্রি উদ্ঘাটিত থাকিবে ও কোন অতিথি রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া না যাইবে, তখন কবিরা গাহিবেন,

পিরীতি নগরে বসতি করিব,
পিরীতে বাঁধিব ঘর,
পিরীতি দেখিয়া পড়শি করিব,
তা' বিনু সকলি পর।"[১]

চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত একখানি পদে রাধার বর্ণনা এইরূপ—

অকথন বেয়াধি কহন নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায়॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥
চণ্ডীদাস বলে কাঁদে কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তার হৃদয়ে জাগিয়া॥

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, "এখানে কে কাহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে সে তর্ক না করিয়াও এ-কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে এখানে রাধা ও গৌরাঙ্গ এক হইয়া মিলিয়া গিয়াছেন।"[২] বৈষ্ণব কবিদের সাধনমার্গের প্রধান আলম্বন রাধা-ভাব। সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন: "চণ্ডীদাসের রচনায় এই ভাবটি সর্ব্বত্রই প্রস্ফুটিত শতদলের ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। চণ্ডীদাস সর্ব্বত্রই এই ভাবের পূর্ণপরিণতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় বহু স্থানে দৈহিক মিলনের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই বটে, কিন্তু

১. রবীন্দ্র রচনাবলী—জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ—ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃঃ ৬৩৫
২. শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে, পৃঃ ২৭২

তাহা পার্থিব ইন্দ্রিয়োপভোগের কামনা দ্বারা কলুষিত নহে।...বঙ্গের ২হু কবির কাব্যে নায়ক-নায়িকার মিলনের বর্ণনায় আমিষের একটা উগ্র গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু চণ্ডীদাসের ঐরূপ কোন বর্ণনায় সে গন্ধ নাই; তাহার পরিবর্তে যে সৌরভে আমরা পরিতৃপ্ত হই, তাহা সুমিষ্ট, হৃদয়োন্মাদক, তাহা পারিজাতের পবিত্র গন্ধে ভরপুর।"[১]

'প্রেমবৈচিত্ত্য' সূত্রের অবলম্বনে চণ্ডীদাসের পদ-বিচার: যে প্রেম চিত্তকে অতিশয় আর্দ্র বা সিক্ত করে তা হইল স্নেহ।[২] এই স্নেহ হতে প্রিয়ের কোন অনিষ্টের আশঙ্কা প্রিয়তমার মনে জাগৃত হয়। অতিশয় অভিলাষাত্মক স্নেহই রাগে পর্যবসিত হয়।[৩] নায়িকার চিত্তে রাগ সঞ্জাত হলে ক্ষণকালের বিরহেও অত্যন্ত অসহিষ্ণুতার লক্ষণ দেখা যায়। আবার প্রিয়ের সহিত মিলনে পরম দুঃখকে সুখরূপে প্রতিভাত হয়; কিন্তু তাঁর বিরহে সব সুখ দুঃখেরই নামান্তর। এই রাগে প্রেমাস্পদকে যা সদাসর্বক্ষণ নব নব ভাবে অনুভূত করায় এবং নিজেও যা অনুক্ষণ নব নব ভাব ধারণ করে তা-ই হল অনুরাগ। প্রিয়তমের নিকটে থেকেও প্রেমের উৎকর্ষ হেতু বিরহের যে বেদনা তাকেই 'প্রেমবৈচিত্ত্য' বলে।[৪] কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন—"সম্ভোগেরই একটি অঙ্গ প্রেমবৈচিত্ত্য। সম্ভোগের মধ্যে অন্য কোন রসের বা ভাবের ছায়াপাত হইলে প্রেমবৈচিত্ত্য ঘটে, সকল সম্ভোগই সঙ্কীর্ণ সম্ভোগে পরিণত হয়। পদকর্তারা মিলনের মধ্যে বিরহ-ভ্রান্তি ঘটাইয়া প্রেমবৈচিত্ত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। আসল প্রেমবৈচিত্ত্য ইহাকে বলা যায় না। প্রণয়িজন কণ্ঠাশ্লিষ্ট থাকিলেও

১. চণ্ডীদাস পদাবলী—বসুমতী সংস্করণ ভূমিকা, পৃঃ ৫৩
২. চেতোর্দ্রবাতিশয়াত্মকঃ প্রেমৈব স্নেহঃ।—প্রীতিসন্দর্ভ : জীবগোস্বামী
৩. স্নেহ এবাভি লাষাতিশয়াত্মকো রাগঃ।—প্রীতিসন্দর্ভ : জীবগোস্বামী
৪. প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেহপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যাবিশ্লেষধিয়ার্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥—উজ্জ্বলনীলমণি

উপভুক্তা মিলন সুখ মুগ্ধা নায়িকার চিত্তের যদি অন্যথা বৃত্তি হয়, তবেই তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলা যায়।[১] চণ্ডীদাসের একখানি পদে—

পিরীতি সুখের সাগর দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায়॥
কেবা নিরমিল প্রেম সরোবর
নিরমিল তার জল।
দুঃখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল॥
গুরুজন জ্বালা জলের শিহালা
পড়সী জিয়ল মাছে।
কুলপাণি ফল কাঁটা যে সকল
সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক পানায় সদা লাগে গায়
ছাঁকিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তারি ঠাই॥

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র এ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা সত্যই তাৎপর্য ব্যঞ্জক। তিনি বলেছেন, "চণ্ডীদাস প্রথম থেকে যে উচ্চগ্রামে তাঁর প্রেমগীতির

১. পদাবলী-সাহিত্য, পৃঃ ১৪০

সুর বাঁধলেন, তা শুধু যে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যকে ধন্য করেছে, তা নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মকেও প্রেরণা যুগিয়েছে।”[১] সুখে দুঃখানুভবই ‘প্রেম-বৈচিত্ত্য’ পদের আসল পরিচয়। চণ্ডীদাসের আরো একখানি পদে—

যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানু-পথে ধায় রে॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥

রাধার ইন্দ্রিয়বর্গ সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণবশীভূত। রাধা ইন্দ্রিয়নিচয়কে আয়ত্তে আনতে চান, কিন্তু যতই চেষ্টা করেন ততই বিগড়িয়ে যায়। চণ্ডীদাস রাধার মুখে বলেছেন—

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহ কাজে।
নিশি দিশি কাঁদি তবু হাসি লোকলাজে॥
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী॥

আধ্যাত্মিকতার কবি চণ্ডীদাসঃ আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, “চণ্ডীদাসের গীতি-সমূহের ভিতর একটু আধ্যাত্মিকতা আছে, তাহা এত স্পষ্ট যে, অস্বীকার করা যায় না।” নরনারীর প্রেম দিয়ে এ কবিতার ব্যাখ্যা হয় না। পূর্বরাগের প্রথমেই কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য প্রচার আরম্ভ হল। নাম মধুময়। নাম শোনামাত্র অনুরাগে রঞ্জিত হওয়া ‘মানুষী ভালবাসা’র সাহিত্যে বিরল দৃষ্ট। কিন্তু ‘জপিতে জপিতে নাম’ রাধাকে সম্পূর্ণ ‘অবশ’ করে ফেললো। এই নামজপের অসাধারণত্ব বাঙলাকাব্য সাহিত্যে কদাচিৎ মিলে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন পরে আরো বলেছেন, “মনে হয় যেন ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে ভক্ত-চিত্ত আপনা ভুলিয়া যায়, এই দৈহিক বন্ধন তখন থাকিয়াও থাকে না, ইন্দ্রিয়-প্রশমিত মনে—নামের মধুভরা

১. বৈষ্ণব রস-সাহিত্য, পৃঃ ১৩৪

মোহে সর্ব্বাঙ্গ শিথিল ও অবসন্ন করিয়া ফেলে। এই পূর্ব্বরাগ সাধারণ প্রেমের পূর্ব্বরাগের আদর্শ বলিয়া ব্যাখ্যা হইতে পারে, কিন্তু ইহা ঐশ্বরীয় প্রেমের স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করা সহজ হয়।*** চণ্ডীদাসের মানুষী প্রেম ক্ষণেক্ষণে এক উন্নত অমানুষিক প্রেমরাজ্যের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপন্যাস কি কাব্যের সাধারণ আদান-প্রদানময় প্রেমভাব তত ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।"[১] পূর্বরাগ পর্যায়ের পদে রাধার অন্তর কৃষ্ণবিরহে ভরপুর। একা একা তিনি নির্জনে বসে থাকেন। কারো কোন কথা তাঁর কানে প্রবেশ করে না। রাধিকা মেঘ দর্শন করছেন। কালো মেঘ দেখে তিনি বিহ্বল হয়ে যান। কারণ, কালো মেঘকে তিনি কৃষ্ণ অনুমান করছেন। 'মেঘে যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন কৃষ্ণের হাসি অনুমান করে রাধা দু'হাতে প্রিয়ের জন্য আকুলি বিকুলি কি কি যেন বলছেন।'[২] চণ্ডীদাসের অপর একখানি পদে—

পীরিতি পীরিতি সবজন কহে
পীরিতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল নহেত পিরীতি
নাহি মিলে যথা তথা॥
পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে॥
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ।

---

১. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

২. এই ব্যাখ্যা আমার শ্রদ্ধেয় অধাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তীর মুখে শুনেছি।

পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজচণ্ডীদাস ॥

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র চণ্ডীদাস পদাবলীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বিচার করে বলেছেন, "বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাসের মত পিরীতি পাগল আর কেহ ছিলেন না। চণ্ডীদাসের প্রেমের আদর্শ আজিও অম্লান শুভ্রতায় সদ্যঃ প্রস্ফুটিত যুঁই ফুলের মত দেবতার বেদীমূলে উজ্জ্বল হইয়া আছে। প্রেমে—এমন কি মানবীয় প্রেমে—যে তন্ময়তা আনে, তাহারই চরম বিকাশ চণ্ডীদাসের প্রেমে।"[১]

রাধার দুর্জ্জয় তপস্যা। এত তপস্যার পর তিনি বুঝতে পারেন যাঁকে তিনি আপন হতে অতি আপন মনে করেন তিনি অবাঙমনসগোচর। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমত "বৈষ্ণব কবিতা এইভাবে জানা পথ দিয়া লইয়া যাইয়া অজানার সন্ধান দেয়। এই ভাবের পদ চণ্ডীদাসেরও আছে। রাধিকা পরকে আপন করিয়াছেন, আপনার জনকে পর করিয়াছেন; ঘরে মন নাই, ঘর বাহিরের মত হইয়া গিয়াছে—আর বাহিরে অভিসারে যাইয়া যেন আসল ঘর পাইয়াছেন। সারারাত্রি জাগেন—এবং দিনের বেলায় ঘুমে এলাইয়া পড়েন—'রাতি কৈলাম দিবস, দিবস কৈলাম রাতি' কিন্তু যাঁহার জন্য তিনি সর্ব্বস্বত্যাগী প্রেমসাধনা করিলেন, যে প্রেমে প্রাকৃতিক নিয়মের বিপর্য্যয় করিয়া অসাধ্য সাধন করিলেন, সেই পুরুষবরকে ত মুহূর্ত্তকালের জন্যও আপনার জন বলিয়া মনে করিতে সাহস করেন নাই। এত করিয়াও 'বুঝিতে পারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি'। এত ভালবাসা দিয়াও সর্ব্বদা

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে যেন টুটে॥

বৈষ্ণব কবিতা এই সসীম ও অসীমের সন্ধিস্থলে।"[২] কিন্তু বৈষ্ণব

১. বৈষ্ণব রস-সাহিত্য, পৃঃ ৪৮
২. বৈষ্ণব পদাবলীর ভূমিকা, পৃ: ২৮/০—৩/

মহাজনপদকর্তা কিংবা বৈষ্ণবশাস্ত্রকারগণ 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা' করতে চান না।[১] তাঁরা বলেন দেহবুদ্ধিসচেতন মানবপ্রেম কখনো অলৌকিক ভগবৎ প্রেমের আসন লাভ করতে পারে না। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের অনুশাসন যাই হোক না কেন বৈষ্ণব পদাবলী যেভাবে বাস্তব রসসম্পৃক্ত হয়ে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার বিস্তার করেছে তাতে তার লৌকিক দিক মোটেই উপেক্ষিয় নয়।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন "চণ্ডীদাসের রাধা তাই একটি খাঁটি বাঙালী কবির মানসপ্রতিমা—বাঙালী কবির চিত্তধৃত প্রেম-প্রতিমা। এই প্রেম-প্রতিমা রাধার সৃষ্টিতে তাই দেখিতে পাই, বাঙালী কবি এখানে বাংলাদেশ ছাড়িয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান নাই,—বৃন্দাবনভূমি দূর হইতে আসিয়া ক্ষণে ক্ষণে বাঙালী কবির মনোভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তাহার ফলে বাঙালীর কবিমানসের প্রেম-প্রতিমা তাহার প্রাকৃতরূপের ভিতরই দিব্যজ্যোতিতে অপ্রাকৃতের মহিমা লাভ করিয়াছে। আমাদের রাধা-প্রেমে প্রাকৃত কোন স্থানেই অস্বীকৃত নয়—প্রাকৃতই ধীরে ধীরে দিব্য-মূর্তিতে উদ্ভাসিত।"[২]

চণ্ডীদাসের ভাবসম্মিলনের পদ স্তোত্র স্বরূপঃ আবাল্যের সহস্র স্মৃতিবিজড়িত মধুর বৃন্দাবন ছেড়ে কৃষ্ণ মথুরায় গমন করলে নিখিল বৃন্দাবন শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যের জগৎ হতে ঐশ্বর্যময় জগতের অধিবাসী হলেন। কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবনে শ্রীমতীরাধিকার বিরহ ব্যথার কোন পারাপার ছিল না। শ্রীকৃষ্ণও আর বৃন্দাবনে ফিরে এলেন না। শ্রীরাধা প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নিবাতনিষ্কম্প ধ্যান তপশ্চারিণী। রাধার এই ধ্যানতন্ময়তা আমাদিগকে শঙ্করের জন্য পার্বতীর ধ্যানমগ্নতার কথা

---

১. বৈষ্ণব কবি প্রিয়াকে দেবতা করিতে চাহিবেন না, সত্য। কিন্তু মানবের প্রেম যে সেই অখণ্ড প্রেমের প্রাতিভাসিক বিকাশ, তাহা ভুলিলে চলিবে কেন?—অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র

২. শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে, পৃঃ ৩৫৩

স্মরণ করিয়ে দেয়। বহির্লোকে হরিকে হারিয়েও রাধা অন্তর্লোকে তাঁর সঙ্গলাভ করেছিলেন। ভাবরাজ্যে এই মিলনের নাম হল ভাবসম্মিলন। বিরহের অন্ধকার অতিক্রম করে প্রেমিক প্রেমিকা মিলনের জ্যোতির্লোকে উন্নীত হন। তত্ত্বতঃ ভাবসম্মিলন ধ্যানলোকে বিরহ-বিচ্ছেদ বিজয় স্পর্ধী শাশ্বত মিলনের গান। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "এই 'ভাবসম্মেলনে' কৃষ্ণের নিকট রাধা সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। হৃদয়ের অর্গল বন্ধ করিয়া, তিনি মনোমন্দিরে একান্তে তাঁহাকে পাইয়া, যে-সকল মধুর কথা তাঁহাকে বলিয়াছেন, তাহা বৈদিক যাজ্ঞিকের হোমকুণ্ডের পার্শ্বে উচ্চারিত উপনিষদের মন্ত্র।"[১]

ভাবসম্মিলনের পদে বৈষ্ণব কবিগণ লৌকিক প্রেমের বাস্তব রূপায়ণ একেবারে মুছে ফেলেছেন। কবিশেখর কালিদাস রায় বলেন, "বৈষ্ণবপদাবলীর যাহা কিছু উৎকৃষ্ট—যাহা প্রধান অঙ্গ, তাহা কামনার গান নয়—বিপ্রলম্ভাত্মক অনুরাগের বেদনারই গান।"[২] মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীমতীরাধিকার চিত্তে মহাভাবই বৃন্দাবনে রূপকে কেন্দ্র করে বিগ্রহ-তনু লাভ করেছিল। সেরূপ-মাধুরী আবার ভাবের পাথারে পরিক্রমা করল। ভাবসম্মিলনের সুরমাধুর্য এইখানে।

পদাবলী সাহিত্যে ভাবসম্মিলনের পদগুলি বিশেষভাবে রমণীয়—আস্বাদনীয়। ভাবলোকে ত কোন বিরহের বালাই নেই। বিরহের ব্যথা রূপলোকে। ভাবলোকে রাধাকৃষ্ণের নিত্য মিলন. বৈষ্ণব কবিগণ রসাস্বাদনের জন্য 'ভাবকে রূপের মাঝারে অঙ্গ' দান করেছেন। বৃন্দাবনের কালিন্দীকূলে সুবিস্তৃত শ্যামল মাঠ। কৃষ্ণ সে মাঠে আর গোচারণে যাবেন না। সখাদের প্রীতিভালবাসা, যশোদার বাৎসল্য রতি কিংবা শ্রীরাধার মধুর প্রেম কিছুই তাঁকে বেঁধে রাখতে পারল না। এই কারণে ব্রজবাসীদের বিরহ। এটাকে

১. পদাবলী-মাধুর্য্য, পৃঃ ৭৮
২. প্রাচীনবঙ্গ সাহিত্য—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯২

বলা যায় রূপলীলার বিরহ। কিন্তু ভাবরাজ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে সান্নিধ্যলাভ তাতে রূপলোকের বিরহের নামগন্ধ নেই।

সকল মিলনই বিরহের পরে। মিলনের পরে আবার বিরহ ঘনিয়ে আসে এটাও ঠিক। কিন্তু কবিশেখর কালিদাস রায় বলেন, "ব্রজলীলার মঞ্জরীই যেন নিত্য-মিলনের শিলাঘাতে ঝরিয়া পড়ে—ভাবসম্মিলনের পর আর বিরহের ভয় নাই।"[১] অদ্বয়ভাবই ভাবসম্মিলন। এতে দিব্যানন্দ-অনুভবের কথা আছে। এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের একটি উক্তি স্মরণীয়: The true Divine would then be secret within us and perhaps supreme above us; to find the Divine within us and above us would be the real solution.[২]

ভাবসম্মিলনের তত্ত্বানুসারী আলোচনা এক, আর তার কাব্যরস সম্পদ অন্য। কাব্যরসলোকে অনুপ্রবেশ করতে হলে তার পারিভাষিক অর্থ ও তত্ত্ব ভুলে গেলেও কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী তত্ত্বনিরপেক্ষ নয়। এখানে তত্ত্ব বা দর্শন ও কাব্য হাত ধরাধরি করে চলেছে। এ সম্পর্কে কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন, "কীর্তনের রাগসঙ্গীত উপভোগ করিবার আগে যেমন গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ঘটাইতে হয়, ভাবসম্মিলনের পদগুলি উপভোগ করিবার আগে তেমনি ভাবসম্মিলনের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের দ্বারা মনকে প্রস্তুত করিয়া লইলে ভালো হয়।"[৩]

কিন্তু তত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ না করেও পদগুলির রস-সৌন্দর্য উপভোগে কোন বাধা হয় না। শুধু রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলনের রসচিত্র সম্মুখে রেখে এই পদগুলির মাধুর্য আস্বাদনে আমরা কৃতার্থ হই। "রূপময় শ্যামরায় মথুরায় গেলেন, কিন্তু ভাবময় শ্যাম নিত্য মিলনেই থাকিয়া গেলেন।

১. পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ২২৫
২. The Life Divine, পৃঃ ৩৫৬
৩. পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ২২৭

পদাবলীর কবিরা এই নিত্যমিলনের আভাস দিয়াছেন তাঁহাদের পদে।"[১] তাই চণ্ডীদাসের রাধা—

ললিতার কথা শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী
কহিতে লাগিল ধনি রাই।
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
সে কথা ত কভু শুনি নাই॥
হিয়ার মাঝারে মোর এ ঘর মন্দির গো
রতন-পালঙ্ক বিছা আছে।
অনুরাগের তুলিকায় বিছানা হয়্যাছে গো
শ্যামচাঁদ ঘুমায়্যা রয়েছে॥
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
কোন্ পথে বঁধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিব গো
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে॥
শুনিয়া রাইয়ের কথা ললিতা চম্পকলতা
মনে মনে মানিল বিস্ময়।
চণ্ডীদাসের মনে হরষ হইল গো
ঘুচে গেল বিরহের ভয়॥

রাধা বেশ একটু ব্যক্তিত্ব নিয়েই বলে ফেললেন তোমরা যে বল শ্যামচাঁদ তাঁকে (রাধাকে) ছেড়ে মথুরায় ফস্ করে চলে গেছেন। এও কি কখনো সম্ভব হয়? কি করে যাবে? রাধার হৃদয়-মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ যে চিরযুগ ধরে বিরাজ করে আসছেন। সেহেন অন্তরলোকবাসী শ্রীকৃষ্ণকে রাধা যাবৎ না নিজে হৃদয়লোক হতে বিদায় দিচ্ছেন তাবৎ তাঁর কি এমন সাধ্য বা ক্ষমতা আছে যে, তিনি রাধাকে ছেড়ে চলে যাবেন? রাধার মূল বক্তব্য এই—

১. পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ২২৮

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দৈহিক বিচ্ছেদ বা ছাড়াছাড়ি হতে পারে, তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু অন্তরে অন্তরে তাঁর সহিত কৃষ্ণের নিত্যমিলনের আনন্দ-স্পন্দন হচ্ছে। ভাবসম্মিলনের এই পদখানিতে নায়ক-নায়িকার বিরহের আশঙ্কা উপেক্ষা করা হয়েছে। চণ্ডীদাস আরও বলেছেন—

কেবা নিতে পারে নেউক আসিয়া
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ্‌।

এযেন রাধা রীতিমত 'চ্যালেঞ্জ' দিয়ে বসে আছেন। শ্রীকৃষ্ণকে রাধাহৃদয় হতে বলপূর্বক ছিনিয়ে নেওয়া অত সহজ নয়। কবি লৌকিক উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। ঘরে 'সিন্ধ্‌' কেটে বহু মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী চোর চুরি করতে পারে। কিন্তু পাঁজর কেটে কোনমতেই শ্রীকৃষ্ণকে চুরি করে নেওয়া যায় না।

চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত ভাবসম্মিলনের পদে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের অবিনাভাবের অদ্বয়তত্ত্ব দেখান হয়েছে। উৎকণ্ঠা, রূপতৃষ্ণা, প্রতীক্ষা, অভিসার, মান-অভিমান ও বিরহের পালা শেষ হবার পরে প্রেমের যে স্থিরশান্ত অনিবার্য পরিণাম তা ভাবসম্মিলনের এই পদগুলিতে তারই কাব্যময় প্রকাশ ঘটেছে। ভাবসম্মিলনে কবি চণ্ডীদাস শ্রীমতীরাধার মুখে যে পদগুলি স্থাপন করেছেন তার তুলনা নেই। তাই চণ্ডীদাসের 'ভাবসম্মিলনে'র পদ সম্পর্কে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন যে মন্তব্য করেছেন তা-ই হল এর আসল পরিচয়। তিনি বলেছেন "চণ্ডীদাসের ভাবসম্মিলনের পদাবলী স্তোত্ররূপে পাঠ করা যায়। ততোধিক প্রশংসা করিলেও বোধ হয় অন্যায় হইবে না, সেগুলির মত প্রেমের সুগভীর মন্ত্র ধর্ম্মপুস্তকেও বিরল।"[১]

আক্ষেপানুরাগের পদে চণ্ডীদাসের আসল পরিচয়ঃ শ্রীমতী রাধিকার অতীত সম্ভোগসুখ-স্মৃতি যেমন দীর্ঘ, তেমনি রসঘন—তেমনি প্রেমঘন। কবিত্বের দিক দিয়ে পদাবলী সাহিত্যের আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের পদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন একে বলেছেন

১. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

প্রেমবৈচিত্ত্য। কিন্তু প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগের মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে আক্ষেপানুরাগ প্রেমবৈচিত্ত্যেরই একটি দিক বটে। কৃষ্ণের প্রতি রাধার অনুরাগই তো আক্ষেপানুরাগ। রাধার কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ সীমাহীন। লোকভয়, সমাজভয়, আত্মীয়স্বজনের গঞ্জনা-ভয় কম আক্ষেপের কথা নয়। পরম দয়িত কৃষ্ণের সহিত মিলনে যদি এত প্রতিকূলতার উদ্ভব হবে, তবে প্রেমময়ী রাধার আক্ষেপের সীমা থাকবে কেন? কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন, "শ্যাম তাহাকে উপেক্ষা করিতেছেন এই কল্পনা করিয়াও রাধার আক্ষেপ জন্মে, তাহা ছাড়া প্রেমের নিজস্ব একটা জ্বালা (বিষামৃতে একত্র মিশ্রণে) আছে, সেই জ্বালাই আক্ষেপের সুরলাভ করিয়াছে।"[১]

বিরহিনী রাধার আক্ষেপের কোন শেষ নেই। রাধা শ্রীকৃষ্ণের অত্যাশ্চার্য বাঁশীর সুরে কেনইবা মুগ্ধ হলেন। এই আক্ষেপই ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে রাধার কাছে উপস্থিত হয়। কখনো কৃষ্ণ, কখনো মুরলী, কখনো দূতী, কখনো গুরুজন, কখনো রাধার কুল-শীল, কখনো বা বিধাতা, কখনো কন্দর্প, আবার কখনো বা সখী—সকলের বিরুদ্ধেই রাধিকার আক্ষেপ। অপ্রতিরোধ্য কৃষ্ণপ্রেমে রাধাকে শুধু গঞ্জনাই সহ্য করতে হয়।

কৃষ্ণের সহিত মিলনে তাঁর কাছে কোন সহজ উপায়ও নেই। এইভাবে নানা আক্ষেপ নানা সুরে আক্ষেপানুরাগের পদে বিধৃত হয়ে আছে। "চণ্ডীদাস ইহার প্রধান কবি।"[২] চণ্ডীদাসের রাধা নিজেকে ধিক্কার[৩] দিয়ে বলেছেন—

যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে।
আনপথে যাই সে কানুপথে ধায় রে॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥

১. পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ১৫১
২. পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ১৫৩
৩. আক্ষেপানুরাগ বিষয়ে কবিত্ব শক্তির যথেষ্ট অবসর আছে ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ পদ এই সম্বন্ধে রচিত—বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা : ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১১৮

এ ছার নাসিকা মুই যত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ॥

রাধার যাবতীয় ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের বশীভূত। ইন্দ্রিয়পঞ্চ রাধা যতই নিজের আয়ত্তে আনতে চান ততই তা বিগড়িয়ে যায়। রাধা অন্যপথে যেতে চাইলে কি হবে, কৃষ্ণ যেখানে আছেন সেই দিকে তাঁর পদ দু'খানি আপনা আপনি ধাবিত হয়। এ এক বিচিত্র আকর্ষণ। রাধার রসনা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে অনিচ্ছুক। কিন্তু রাধা কৃষ্ণগন্ধ বা প্রসঙ্গ নিরোধ করতে যতই ব্যাকুল হয়, নাসিকা বা কান কোন নিষেধই মানে না। চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণকে বলেন—

কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা॥

রাধা বলেন এই কামনা নিয়ে সাগর জলে ডুবে মরব যাতে পরজন্মে তিনি নন্দের নন্দন কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণও যেন রাধা হয়ে আবির্ভূত হন। রাধা এই মানসকৌশলে শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ রাধাকে এজন্মে যেমন কৃষ্ণ বার বার কাঁদিয়ে ছেড়েছেন, রাধাও তেমনি পরজন্মে কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করে কৃষ্ণকে কাঁদাবেন।

কৃষ্ণকে সম্বোধন করে রাধা বলেন—

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি॥

কোন্ বিধি সিরজিল সোতের শেওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি॥

বন্ধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥

রাধা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলেন: তোমার ন্যায় রমণীর মন আকর্ষণ-কারী ব্যক্তি আর কেউ নেই। ঘরকে করলাম বাইর, বাইরকে করলাম ঘর। পরকে আপন করলাম, আপনকে করলাম অন্য। রাত্রিকে দিন সমতুল্য করেছি, দিনকে করেছি রাত্রি। অর্থাৎ তোমাকে পাবার জন্য এমন কোন অসাধ্য কাজ নেই যা আমি করিনি। রাধার স্বভাব-সংস্কার, আচরণ-বিধি—এমন কি প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করতেও কোন দ্বিধা হয়নি। তথাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের স্বরূপ তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব হল না। শেওলা যেমন জলস্রোতে ভেসে যায়, যেদিকে প্রবাহ সেদিকেই তার গতি বাঁক নেয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের দারুণ স্রোতোবেগে রাধা তাঁর ব্যক্তিত্বের তটভূমি হতে স্খলিত হয়ে অসহায় অবস্থায় ভেসে চলেছেন। রাধা শুধুমাত্র কৃষ্ণের মুখপানে চেয়েই সমস্ত দুঃখ-ক্লেশ-জ্বালা অক্লেশে সহ্য করেন। কিন্তু এমন পরম প্রিয়জনই যদি তাঁর প্রতি নির্মম কঠোর হন, তবে রাধার আর সান্ত্বনা কোথায়? তা-ই যদি হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণিক কাল অপেক্ষা করুক। রাধা তাঁর সামনেই প্রাণত্যাগ করবেন।

কৃষ্ণময়ী রাধার আক্ষেপের আগুনে তাঁর বুক ফেটে যায়। কৃষ্ণবশ রিপুগুলির প্রতি রাধার আক্ষেপে রাধার মূর্তি সজীব হয়ে উঠে:

শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার নাম ধরণীতে লেখি॥

গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥

বাঁশীর প্রতি রাধার আক্ষেপ :

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে।
নিশিদিন কাঁদি সই হাসি লোকলাজে॥
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতিকুল প্রাণ নিল বাঁশী॥

রাধা কৃষ্ণপ্রেমানুরাগের নতুন সঙ্কল্পের কথা ব্যক্ত করেছেন :

কাল মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানুগুণ যশ কানে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিব॥

প্রীতির প্রতি রাধার আক্ষেপ :

সই কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল॥

লুপ্তোপমার সাহায্যে রাধা কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন :

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়॥

প্রেম-নিন্দুক রাধার ধিক্কার : 'শঙ্খ বণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে'—বলেই তাঁর বলা শেষ হয় না। তাঁর আক্ষেপেরও উপশম হয় না। তিনি কানুর উদ্দেশে অকৈতব গভীর প্রেমের দাবী নিয়েও বলেন—

'তোমার পিরীতিলাগি রাখিয়াছি প্রাণ'।

বাঙালীর কবিভাষার প্রতিনিধি চণ্ডীদাস : অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখেছেন, "চণ্ডীদাসের কবিতার প্রধান গুণ তার সরলতা, যাকে আলঙ্কারিকেরা

বলেন প্রসাদগুণ। একজন কবি যেমন চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে বলেছেন, 'সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদগুণেতে ভরা'। তাঁর ভাষায় আড়ম্বর নেই, অলঙ্কারের বালাই নেই। সহজ সরল ভাষায় তিনি প্রাণের কথা বলেছেন। সেই প্রাচীন যুগে যখন বাংলা কবিতার কোনো আদর্শ ছিল না বললেই হয় তখন তিনি এমন স্বচ্ছ, সরল প্রাণস্পর্শী ভাষায় কেমন করে কবিতা লিখতে পারলেন এ ভাবলে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না।"[১] অনুভূতির নিবিড়তা থাকলেই কবির নিরলঙ্কার ভাষাও আমাদের অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করে। চণ্ডীদাসের ছিল অসাধারণ শব্দ-প্রয়োগশক্তি। ঠিক এই কারণেই তাঁর কবিতা আমাদের 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করে। একেই জন মিড্‌লটন মারে বলেছেন, Style is the man himself.[২]

চণ্ডীদাস মধ্যযুগের বাঙালী কবি। তাঁকে বাঙলা কবিভাষার স্রষ্টাও বলা হয়। স্বদেশভূমি ও পারিপার্শ্বিক জীবন হতে তিনি তাঁর কাব্য-উপাদান—ভাষাসম্ভার আহরণ করেছেন। তাঁর কাব্যে সংস্কৃতের প্রভাব থাকলেও তৎসম শব্দের প্রাধান্য কম। বাঙালীর চিত্ত মুগ্ধ হয়েছে এমন আরো তিনজন কবির নাম করা যায়—কৃত্তিবাস ওঝা, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এবং কালী-সাধক রামপ্রসাদ সেন। মোট এই চারজন কবির মধ্যে বাঙালীর সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম কবি চণ্ডীদাস। বাঙালী জাতির হৃদয়মন আকর্ষণ করবার যে অলৌকিক যাদু শক্তি চণ্ডীদাসের হাতে ছিল তাকে অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন, "কবির ভাষা ও ভঙ্গীর অকৃত্রিম বাঙালীত্ব।"

মুকুন্দরাম খাঁটি বাঙালী কবি। তিনি বাঙালীর জাতীয় জীবনের চিত্রকর। সমগ্র সমাজ জীবন, জাতির আচার-আচরণ, তার সংস্কার ও সাংস্কৃতিক জীবন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু চণ্ডীদাসের কাব্যে সমগ্র বাঙালী জীবনযাত্রার ছবি নেই। না থাকবার কারণ—মুকুন্দরাম

১. বৈষ্ণব রস-সাহিত্য, পৃঃ ১২৮
২. The Problem of Style, পৃঃ ১২

কলহান্তরিতার—

(ক) শুনইতে কানু-মুরলীরব মাধুরী

মাথুরের—

(ক) যাঁহা পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত

প্রভৃতি পদ বৈষ্ণব-কবিতারূপ স্বর্ণহারের মধ্যে অত্যুজ্জ্বল মুক্তার দীপ্তিতে ভাস্বর।

কিন্তু অভিসারের পদাবলীতে গোবিন্দদাসের জুড়ি মিলে না। জ্যোৎস্নাভিসার, দিবাভিসার, গ্রীষ্মাভিসার, হিমাভিসার, তিমিরাভিসার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের অভিসারের এত বৈচিত্র্য আর কোন কবির পদে দেখা যায় না। মানবাত্মার অভিসার বলিতে আমরা যা বুঝি গোবিন্দদাসের পদগুলি তাহারই দ্যোতক।

(ক) কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল

(খ) মন্দির বাহির কঠিন কপাট

(গ) কুল মরিয়াদ—কপাট উদ্ঘাটলুঁ

ইত্যাদি পদে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য রাধার আকুলতা স্বতঃই আমাদিগকে দেহাতীত জগতে পৌছাইয়া দেয়।

গোবিন্দদাসের প্রকাশভঙ্গী অনবদ্য এবং তাঁহার পদগুলি রসোত্তীর্ণ হইবার ইহাও অন্যতম প্রধান কারণ। গোবিন্দদাসের মত চিত্রকল্প আর কোন কবিই নির্মাণ করিতে পারেন নাই। সুরধুনীতীর উজোর করিয়া গোরার ভ্রমণের চিত্র, দুস্তর পন্থা অতিক্রম করিবার জন্য শ্রীমতী যেভাবে অভিসার করেন তাহার চিত্র এবং আরও অন্যান্য চিত্র আমাদের মনে বাস্তব জগতের অনুভূতি জাগাইয়া দেয়। রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত গোরাকে মানস-নয়নে রাখিয়াই গোবিন্দদাস তাঁহার পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন। এইজন্যই তাঁহার বিরহব্যাকুলা রাধা আমাদিগকে মহাপ্রভুর কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলা হইয়া থাকে। ইহার প্রধান কারণ গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির মত ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়াছিলেন; এবং অনেক সময় তাঁহাদের রচিত পদের পার্থক্য নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। গোবিন্দদাসের রচনাভঙ্গী, পদবিন্যাস চাতুর্য এবং অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগ স্বভাবতই তাঁহাকে বিদ্যাপতির পাশে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিষ্য গুরুকে অতিক্রম করিয়াছেন। বৈচিত্র্য ও মাধুর্যের দিক দিয়া গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকে নিঃসন্দেহে অতিক্রম করিয়াছেন। মৌলিক কল্পনা ও শব্দচয়ন কৌশলের দিক দিয়াও গোবিন্দদাস অগ্রণী ছিলেন।

গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতির মধ্যে আরও একটি মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। বিদ্যাপতি ভক্ত নহেন, কবি। গোবিন্দদাস যত বড় ভক্ত তত বড় কবি। এক বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলে বিদ্যাপতি তাঁহার রাধাকে উচ্চাঙ্গের নায়িকারূপে অঙ্কন করিয়াছেন। তাঁহার রাধা ভাববিলাসিনী, বিদগ্ধা ও খরদীপ্তিময়ী। তিনি কখনই কৃষ্ণপ্রেমে অন্ধ গোবিন্দদাসের রাধার মত মাধবের 'অভিসারক লাগি, দুতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি'—প্রয়োজন বোধ করেন না। তাহার কারণ বিদ্যাপতির রাধায় কোন তত্ত্ব নাই, গোবিন্দদাসের রাধা তত্ত্বেরই মানবীরূপ।

চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস

চণ্ডীদাসের কবিকৃতি আলোচনা করিবার সময় চণ্ডীদাস সম্পর্কিত সমস্যাটি আমাদের মনে না থাকাই ভাল। পদাবলীতে কবি ও সাধক চণ্ডীদাসের যে-রূপটি প্রকটিত হইয়াছে তাহারই ভিত্তিতে আমরা চণ্ডীদাসের পদ আলোচনা করিব।

বৈষ্ণব পদাবলীর যে-সমস্ত পদের অপরূপ সৌন্দর্য ও ভাবগাম্ভীর্য আমাদের মনে চিরমুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে তাহার অধিকাংশ পদই

চণ্ডীদাসের রচনা। চণ্ডীদাসের ভাষা সহজ, অনাড়ম্বর কিন্তু অপূর্ব ব্যঞ্জনাশক্তিসম্পন্ন। বৈষ্ণব পদকর্তাগণের কৃতিত্ব বিচার করিতে গেলে তাঁহাদের ছন্দ, অলঙ্কার ও প্রকাশ বৈচিত্র্য যেমন একদিকে বিচার্য তেমনি অপরদিকে তাঁহাদের অঙ্কিত রাধা চরিত্রের পরিকল্পনাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হয়। অন্যান্য কবিগণ সাধারণতঃ অনভিজ্ঞা বালিকা রাধাকে ধীরে ধীরে রসময়ী নায়িকাতে পরিণত করিয়াছেন এবং পরিণামে তাঁহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ভাব জাগ্রত করিয়া তাঁহাকে অপার্থিব জগতে উন্নীত করিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীদাস কোনপ্রকার ভূমিকা না করিয়াই রাধাকে কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারারূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। চণ্ডীদাস অঙ্কিত পূর্বরাগের পদগুলিই তাহার প্রমাণ।

চণ্ডীদাস পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ কবি। রাধা তখনও কৃষ্ণকে দেখেন নাই। কিন্তু তাঁহার নাম শুনিয়াছেন। এই নামই তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। তাই রাধা ভাবিতেছেন শুধু নামের প্রতাপে যখন তাঁহার অঙ্গ অবশ হইয়া আসিতেছে তখন তাঁহার অঙ্গের স্পর্শে না জানি কি হয়। কৃষ্ণপ্রেম রাধাকে উন্মনা করিয়া তুলিয়াছে। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তিনি কৃষ্ণ-দরশনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার অন্তরের এই ব্যথা প্রকাশ করা যায় না।

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ-পানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমত যোগিনী পারা॥

রাধার এই 'অকথন বেয়াধি কহন নাহি যায়।' কানুকে লাভ করিবার জন্য তিনি অস্থির। তাই 'যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়।' কানুকে পাইয়াও রাধার শান্তি নাই। মিলনের আনন্দ হইতে বিচ্ছেদের ভয়ই তাঁহার অধিক। তাই—

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

আক্ষেপানুরাগের পদেও চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। চণ্ডীদাস ছিলেন দুঃখের কবি, তাই বেদনাবিদ্ধ শ্রীমতীর মূর্তি তিনি অঙ্কিত করিতে পছন্দ করিতেন। রাধা স্থির করিয়াছেন কৃষ্ণকে ভুলিয়া গিয়া তিনি এই অনলসম যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। কিন্তু—

যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে।
আনপথে যাই সে কানু-পথে ধায়রে॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বামরে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥

তাই তিনি বলেন—

বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে॥

কালার জন্য রাধা 'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর' তবু কালার পিরীতি তিনি বুঝিতে পারিলেন না। না বুঝিয়াও তিনি কৃষ্ণের নিকট জীবন-যৌবন সমর্পণ করিয়াছেন এবং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেন যেন—

জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি।

অবশেষে কৃষ্ণের সঙ্গে ভাবসম্মিলন। অন্তরে কৃষ্ণের মূর্তি দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। মনের গহনে তিনি তাঁহাকে লাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে ভুলিয়া মথুরায় ছিলেন কিন্তু তজ্জন্য কোন ক্ষোভ নাই। অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও তিনি প্রেমাস্পদের কুশলপ্রার্থিনী।

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা ব'লে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥

বেদনার সমুদ্র মন্থন করিলে যে-অমৃত উত্থিত হয় তাই প্রেম। প্রেম বেদনার ধন। সুখের আশায় চণ্ডীদাসের রাধা প্রেম চাহেন না। কারণ তিনি জানেন সুখের আশায় যে প্রেম করে পরিণামে সে দুঃখই পায়।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বৈষ্ণব কবিতার দুই দিকপাল কবি। স্বভাবতঃই এই দুইজনের বৈশিষ্ট্যের কথা মনে জাগে। চণ্ডীদাসের 'রাধা মুগ্ধা নায়িকা নহেন—প্রেম-প্রৌঢ়া নারী। আপনার পূর্ণ-বিকশিত পরিণত প্রেমিক সত্তাটিকে লইয়া তিনি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি। চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতি অনুরাগ। বিদ্যাপতির অনেক স্থলে ভাষার সৌন্দর্য বর্ণনার মাধুর্য আছে; কিন্তু চণ্ডীদাসের নূতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ত্ব আছে, আবেগের গভীরতা

আছে। চণ্ডীদাসের 'পিরীতি' গভীর দুঃখ বেদনার পথেই সুখের সন্ধান করিয়াছে। বিদ্যাপতির রাধা তরুণী নায়িকা, চণ্ডীদাসের রাধা প্রবীণা সাধিকা। প্রৌঢ় প্রেমের পূজারী বলিয়াই চণ্ডীদাসের প্রেমে সাধক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে।' (রবীন্দ্রনাথ)

চণ্ডীদাসের রাধাকে প্রথম যখন আমরা দেখিলাম তখনই তিনি 'মহাযাগিনীর পারা।' তাঁহার প্রেমতপস্বিনী রাধা আমাদিগকে অনিবার্য-ভাবে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত চৈতন্যদেবের কথা মনে করাইয়া দেয়।

জ্ঞানদাস—জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য। তিনি যেভাবে তপস্বিনী শ্রীরাধার মূর্তিটি নিরাভরণ ও নিরলঙ্কার ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা হইতে চণ্ডীদাসের রাধাকে পৃথক করা যায় না। নায়িকার রূপবর্ণনা, অতৃপ্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষার তীব্র জ্বালা, মিলনের জন্য ব্যাকুলতা, মিলনের গভীর উল্লাস এবং বিরহের মর্মস্পর্শী আর্তি জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের মতই ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন।

জ্ঞানদাসের—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

অথবা,

রূপের পাথরে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥

প্রভৃতি পদ প্রেমের দেশ-কালজয়ী কাব্য রূপ। রূপ বর্ণনায় জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের চেয়েও অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার 'এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে' প্রভৃতি পদ তাঁহার রূপ বর্ণনার কৃতিত্ব বহন করিতেছে। তাঁহার গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলি, যেমন—

সহচর-অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া।
চলিতে না পারে খেনে পড়ে মুরছিয়া॥
অতি দুরবল দেহ ধরণে না যায়।
ক্ষিতি তলে পড়ি সহচর-মুখ চায়॥

পদগুলি বিরহকাতরা শ্রীরাধার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

চণ্ডীদাসের পদ হইতে জ্ঞানদাসের পদকে অনেক সময় পৃথক করা যায় না। যেমন, 'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু' এই পদটি কাহার রচনা এই সম্পর্কে সংশয় দূর করিবার উপায় নাই।

'জ্ঞানদাস নায়িকা অপেক্ষা নায়কের রূপ-বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যে বা অলঙ্কার-শাস্ত্রে নায়কের রূপের কোনো আদর্শ নাই—সুতরাং জ্ঞানদাস অনেকটা স্বাধীন-ভাবেই নায়কের রূপ কল্পনা করিয়াছেন। এই রূপ-কল্পনায় শুধু অলঙ্কার—সজ্জা বর্ণনা বা বাঁধা-ধরা উপমারই প্রয়োগ নাই, আছে মুগ্ধা নায়িকার দৃষ্টিতে সৌন্দর্যতরঙ্গের সচল-প্রবাহ। শ্রীকৃষ্ণের রূপকে যমুনা-তরঙ্গে আন্দোলিত চন্দ্র-প্রতিবিম্বের সহিত ও উহার রক্ত-চন্দন-চর্চিত শ্যামদেহকে কালিন্দীর জলে ভাসানো জবা-পুষ্পের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। চণ্ডীদাস নায়িকার রূপ অপেক্ষা তাহার আত্মহারা ভাবতন্ময়তা, কৃষ্ণ-নাম-জপে অভিনিবিষ্টচিত্ততার উপরই বেশী জোর দিয়াছেন। আক্ষেপানুরাগের পদে উভয়েরই সমান কৃতিত্ব, উভয়েরই ভাষা সরল, অলঙ্কার-বর্জিত ও মর্মস্পর্শী; জ্ঞানদাসের পদে আবেগের সহিত দার্শনিক তত্ত্ব ও আধুনিক অন্তর্দৃষ্টিশীল কল্পনা—মননের কিছুটা সংমিশ্রণ আছে। প্রেমের আত্মনিবেদনের পদে উভয়েই মানব-জীবনের সীমা ছাড়াইয়া ভাবাদর্শের উর্ধ্বলোকে বিচরণ করিয়াছেন। ভাব-বৈচিত্র্যে জ্ঞানদাসের ও অনুভূতি-গভীরতায় চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব। পদাবলী-সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ ও কাব্যগুণের পরাকাষ্ঠা এই দুই মহাকবির রচনায় উদাহৃত হইয়াছে।' (ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

বৈষ্ণব পদাবলীর নানাদিক

বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য

পদাবলী কাব্যকে বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাষ্য বলা হইয়া থাকে। সুতরাং বৈষ্ণব তত্ত্বের সঙ্গে যাঁহার সম্যক পরিচয় আছে শুধুমাত্র তিনিই এই কাব্যের রস আস্বাদন করিতে পারেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, আনন্দলাভই যদি কাব্যপাঠের উদ্দেশ্য হয় তবে তত্ত্বকে বাদ দিয়াও এই কাব্যের রসাস্বাদন সম্ভব কিনা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, বৈষ্ণব পদকর্তাগণ সকলই ভক্ত মহাজন ছিলেন। যে-ভক্তির প্রবাহ তাঁহাদের অন্তরকে প্লাবিত করিয়াছিল তাঁহারা তাহাকেই কাব্যরূপে বিধৃত করিয়াছেন। যে-বিশিষ্ট ভক্তিবাদ বৈষ্ণবধর্মের মূলভিত্তি তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই ইহা হইতে জাত কবিতার রস পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন সম্ভব। তাই পদাবলীর কাব্য বুঝিতে হইলে আগে চিনিতে হইবে সমষ্টিগতভাবে বৈষ্ণবকে এবং তাঁহাদের আচরিত ধর্মের মূল উৎসকে।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য প্রচারিত অদ্বৈতবাদের ভাষ্যকে কেন্দ্র করিয়া তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এই তত্ত্বই মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কাছে এক নূতন ব্যাখ্যায় পরিণতি লাভ করে এবং ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মতে ব্রহ্মের লীলাময় রূপ হইতেছেন ভগবান। 'শ্রীকৃষ্ণ সৎ, চিৎ ও আনন্দের মূর্তিমান বিগ্রহ, নরাকার ভগবান। সৎ-এর শক্তি সন্ধিনী—অর্থাৎ যাহাতে ভগবানের অস্তিত্ব ঘোষিত হইতেছে, চিৎ-এর শক্তি সম্বিৎ—যাহা দ্বারা ভগবানের চৈতন্যময় সত্ত্বাটি প্রকাশিত হইতেছে, এবং আনন্দ-এর শক্তি

হ্লাদিনী। এই হ্লাদিনীর সার অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণতম প্রকাশ রাধিকা।' কৃষ্ণ এই রাধিকার সঙ্গে প্রেমলীলায় বিভোর। কৃষ্ণ আপন আনন্দশক্তির আস্বাদনের জন্যই জীবকে সৃষ্টি করিলেন। বৈষ্ণব দর্শনের মতে 'জীবমাত্রেই নারী পুরুষ নির্বিশেষে কৃষ্ণের আনন্দশক্তির অংশ।' জীবের প্রতীক শ্রীরাধিকা, কৃষ্ণ অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামে রাধিকার সঙ্গে প্রেমলীলায় রত। 'সংক্ষেপে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার অর্থ সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আপন আনন্দেরই অভিনব উপায়ে আস্বাদন। তত্ত্বের দিক হইতে রাধা কৃষ্ণের স্বশক্তিরই অভিব্যক্তি বলিয়া স্বকীয়া এবং লৌকিক দৃষ্টিতে আয়ানবধূ রাধা কৃষ্ণের পরকীয়া। জীব রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের সহস্র বন্ধনে বাঁধা বলিয়া জগতের স্বকীয়, ভগবানের পরকীয়। ভগবানের আহ্বানে সাড়া দিতে হইলে জীবকে সংসার-বন্ধন তুচ্ছ করিয়া বাহির হইতে হয়। ইহাই পরকীয়ার অভিসার।' ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী, রাধা সকলেই হ্লাদিনীর মানবীরূপ। তন্মধ্যে রাধাতে হ্লাদিনীর পূর্ণতম প্রকাশ। রাধার ও ললিতা-বিশাখা প্রভৃতির কৃষ্ণরতি স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া তাঁহাদের সাধ্য-ভক্তি। জীবের কৃষ্ণ-ভক্তি সাধন সাপেক্ষ বলিয়া তাহা সাধন ভক্তি। অর্থাৎ জীবকে গোপীদের অনুগত হইয়া কৃষ্ণকে সাধনা করিতে হইবে। একমাত্র চৈতন্যদেবই রাধাভাবে ভজনার অধিকারী ছিলেন।

'কাম গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধনায় স্বীকৃত কিন্তু দেহ-স্পর্শহীন নির্মল ভাব-মাত্রে রূপান্তরিত। ভাববৃন্দাবনে কান্ত কৃষ্ণের সহিত কান্তারূপে ভক্তের বিপ্রলম্ভ—সম্ভোগাত্মক নিরবচ্ছিন্ন প্রেমানন্দই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের একমাত্র কাম্য। প্রেম ও কৃষ্ণ এক।' আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাকে ভক্ত বৈষ্ণব কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছায় সমর্পণ করেন। রাধাভাবে ভাবিত জীবাত্মা পরমাত্মা কৃষ্ণের সহিত যখন অন্তর্বৃন্দাবনে প্রেমবিলাস করেন তখন দ্বৈতভাবের ক্ষণিক তিরোভাব ঘটে। লীলার জন্য কৃষ্ণ আপন

আনন্দাংশ হইতে যে-জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন সেই জীব তখন তাঁহার সঙ্গে একাত্ম হইয়া যায়। তখন,—

না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি ॥

ইহাই হইল মোটামুটিভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব। এই তত্ত্বকে বৈষ্ণব কবিরা কাব্যরূপ দিয়াছেন। এই কাব্যের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ নায়িকা শ্রীরাধিকা। ইঁহাদের বিরহ-মিলন-মধুর প্রেমকাহিনীই বৈষ্ণব কাব্যে রূপ পাইয়াছে। বলাই বাহুল্য বৈষ্ণব কবিরা তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক জগৎ হইতে সাধারণ নর-নারীর প্রেমলীলার দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হইলে রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমকাহিনী এত সুমধুর ও মর্মস্পর্শী হইত না। বৈষ্ণব কবিরা সবসময়েই সচেতনভাবে বৈষ্ণব তত্ত্বকে অনুসরণ না করিলেও এই তত্ত্বের প্রভাব তাঁহাদের মনে সর্বদাই সজাগ ছিল।

(উদ্ধৃতিগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থের অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী লিখিত ভূমিকা হইতে গৃহীত)।

ব্রজবুলির প্রয়োগ

ব্রজবুলি বৈষ্ণব পদাবলীতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ব্রজবুলিকে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাণ বলিয়া উল্লেখ করিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। ব্রজবুলি সম্পর্কে সাধারণ ধারণাটি এই যে, দ্বাপর যুগে রাধাকৃষ্ণ বোধ হয় এই ভাষাতেই কথা বলিতেন—ইহাই ছিল ব্রজের বুলি। আসলে ব্রজবুলি একটি কৃত্রিম ভাষা। ইহা পূর্বীহিন্দী-প্রভাবিত মৈথিলী ও অপভ্রংশ মিশ্রিত ব্রজপুরী নামে একটি উপভাষা মাত্র। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি এই ভাষায় তাঁহার অমর

বৈষ্ণব কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিলেন। তৎকালে মিথিলা বিদ্যাচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল বলিয়া বহু বাঙ্গালী ছাত্র তথায় অধ্যয়নের নিমিত্ত যাইত। তাহারা মুখে মুখে বিদ্যাপতির পদ বাঙ্গলাদেশে নিয়া আসিত। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে আসিয়া ইহার সঙ্গে অনিবার্যভাবেই বাঙ্গলাও মিশিয়া যাইত। ফলে ব্রজপুরী (মৈথিলী) ও বাঙ্গলা মিশ্রিত একটি সম্পূর্ণ কৃত্রিম ভাষার সৃষ্টি হইল। বিদ্যাপতির পদাবলী অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়াতে ইহার ভাষা যেমন বিকৃত হইল (মৈথিলীর সঙ্গে বাঙ্গলা মিশিয়া গেল) তেমনি ব্রজপুরী নামটিও বিকৃত হইয়া ব্রজবুলি (পু=বু, রী=লী বা লি) হইয়া গেল।

যাহা হোক এই কৃত্রিম ভাষাই ষোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব কবিতার প্রায় মুখ্য বাহন হইয়া দাঁড়াইল। এমনকি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, তাঁহার কৈশোরের শ্রেষ্ঠ রচনা 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এই ব্রজবুলি ভাষাতেই লিখিয়াছিলেন। ব্রজবুলির জনপ্রিয়তা লাভের মূল কারণটি অনেকটা ভাবালুতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। রাধাকৃষ্ণ এই ভাষায় কথা বলিতেন, বিদ্যাপতির পদের মাধুর্য এবং ব্রজবুলির সুমিষ্ট উচ্চারণ প্রভৃতি একসঙ্গে মিলিয়া এই কৃত্রিম ভাষাটিকে এত জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গালী কবিগণের মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজ ব্রজবুলি ভাষার প্রয়োগে প্রভূত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক বৈষ্ণব কবিই কিছু না কিছু ব্রজবুলি ব্যবহার করিয়াছেন। ব্রজবুলিতে রচিত পদের কিছু নমুনা দেওয়া গেল—

(ক) অবনত আনন কএ হম রহলিহুঁ
বারল লোচন-চোর।
পিয়া-মুখ-রুচি পিবএ ধাওল
জানি সে চাঁদ চকোর॥

ততহুঁ সঞো হঠে হটি মোঞে আনল.
ধএল চরণ রাখি।
মধুপ মাতল উড়এ না পারএ
তইঅও পসারএ পাঁখি।
(বিদ্যাপতি)

(খ) যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই॥
দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি।
আমারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥
(গোবিন্দদাস)

চৈতন্যদেব ও রাধাতত্ত্ব

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বৈষ্ণব কবিদের মনোজগতে এক গুরুতর পরিবর্তন দেখা দেয় এবং বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী বিশেষরূপে পরিবর্তিত রূপ লাভ করে। চৈতন্যদেবের প্রেমভাব তৎকালীন বঙ্গদেশের সমাজজীবনে গুরুতর আলোড়নের সৃষ্টি করে। তাঁহার ভাবাবিষ্ট মূর্তি এবং আ-দ্বিজচণ্ডালে প্রেমভক্তি বিতরণ তাঁহাকে জীবন্ত অবতারের পর্যায়ে উন্নীত করিয়া দেয়। চৈতন্যদেবের মানবমূর্তি জনসাধারণের মনে যে-ভাবেরই উদ্রেক করিয়া থাকুক না কেন ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে তাঁহার আবির্ভাবের পশ্চাতে একটি গূঢ় কারণ রহিয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার মর্তে আবির্ভাবের একটি সুস্পষ্ট কারণ আছে। শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা

কিরূপ, শ্রীরাধা কৃষ্ণের যে-মাধুর্য আস্বাদন করেন ত হা কি প্রকার এবং কৃষ্ণের অনুভব-জনিত সুখধারা কিভাবে শ্রীরাধার অন্তরে অনুভূত হয় এই তিনটি বস্তুর লোভে শ্রীহরি নবদ্বীপে শচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' হইয়া অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাবকান্তি ধারণ করিয়া আবির্ভূত হন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণ একাকী নদীয়ায় আবির্ভূত হন নাই। শ্রীরাধার সঙ্গে মিলিত হইয়া একাত্ম হইয়া তিনি আবির্ভূত হইলেন—

শ্রীরাধার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরূপ আস্বাদিতে হইলে অবতার ॥

বৈষ্ণবের তত্ত্বদৃষ্টিতে গৌরচন্দ্র একাধারে রাধা ও কৃষ্ণ। তিনি বহিরঙ্গে রাধা অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ। চৈতন্যোত্তর পদাবলী প্রধানতঃ অনুপ্রাণিত হইয়াছে গৌরচন্দ্রের রাধাভাবে অনুপ্রাণিত রাগানুরাগা ভক্তির দ্বারা। তাঁহার মত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ভক্তের পক্ষে রাধাভাব সম্ভব। কিন্তু ভক্ত সাধারণের জন্য তাঁহার উপদেশ গোপীভাব—সখীর আনুগত্যে রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা। গৌরচন্দ্রের প্রেমলীলার যাঁহারা প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা তাঁহাদের অনেকে যেমন মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বাসুদেব, মাধব, গোবিন্দ ঘোষ, বংশীবদন চট্ট তাঁহার ভাববিলাসের প্রতিটি রূপ নিপুণ তুলিকায় চিত্রায়িত করিয়াছেন। ঐ চিত্ররাজি আশ্রয় করিয়া উত্তরকালের বহু মহাজন অজস্র পদ রচনা করিয়াছেন। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বৈষ্ণবের তত্ত্বদৃষ্টিতে গৌরচন্দ্র একাধারে রাধা ও কৃষ্ণ। 'গৌরচন্দ্রের লীলাকে ভক্ত বৈষ্ণবেরা কান্ত কৃষ্ণের সঙ্গে কান্তা গৌরচন্দ্রের নিরবচ্ছিন্ন মানস প্রেমলীলারূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। এক কথায় গৌরলীলা বৃন্দাবনলীলার ভাব-প্রতিরূপ।'

স্বরূপ গোস্বামী, রায় রামানন্দ প্রমুখ আচার্য বৈষ্ণবগণ চৈতন্যদেবকে এই চক্ষে দেখিয়াছিলেন। শচীমাতার দীক্ষাগুরু সুবৃদ্ধ অদ্বৈত আচার্য,

স্বামী শ্রীবাস আচার্য, অসাধারণ পণ্ডিত প্রবীন বাসুদেব সার্বভৌম প্রমুখ মনীষীবৃন্দ তাঁহাকে ভগবান বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন। গৌরচন্দ্র ছিলেন রাধাভাবে ভাবিত। তাঁহার স্বর্ণকান্তি তনু রাধার কল্পিত তনুর অনুরূপ ছিল বলিয়া ভক্তেরা বহিরঙ্গে তাঁহাকে রাধাভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'মহাপ্রভু ছিলেন বিপ্রলম্ভের মূর্তিমান বিগ্রহ'—তাঁহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবল ছিল বিরহ-বিপ্রলম্ভ, রাধাভাবে ভাবিত গৌরচন্দ্রের ভাবস্পন্দনের বিচিত্র অভিব্যক্তি তাঁহার ভক্তমণ্ডলী বারবার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মধ্য দিয়াই তাঁহারা ভাব-বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার গভীর তাৎপর্যের রসরূপটি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই বাসুদেব বলিয়াছেন, মহাপ্রভুর আবির্ভাব না হইলে,—

> রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা জগতে জানিত কে ॥
> মধুর বৃন্দাবিপিনমাধুরী প্রবেশ চাতুরীসার।
> বরজযুবতী—ভাবের ভকতি শকতি হইত কার ॥

লীলাশুক বৈষ্ণব কবি

বৈষ্ণব কবিগণ সকলেই মহাজন ছিলেন। অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিই চৈতন্যদেবের শিষ্য-প্রশিষ্য দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ঐ সকল পদকর্তারা নিজেদের ব্রজলীলার অঙ্গীভূত মনে করিতেন। ইঁহারা গোষ্ঠলীলার পদাবলীতে নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের সখা এবং মধুর রসের পদাবলীতে সখীস্থানীয় মনে করিতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের যে তত্ত্ব ইঁহাদের রচিত পদাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল সেই তত্ত্ব অনুসারে এই সকল কবিরা নিজেদের 'লীলাশুক' বলিয়া ভাবিতেন। অর্থাৎ অপার্থিব ব্রজলীলা শুক-সারীর ন্যায় মধুর কণ্ঠে কীর্তন করাই তাঁহারা তাঁহাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন।

অপার্থিব বৃন্দাবনধামে রাধা ও কৃষ্ণ সখীগণসহ লীলায় মগ্ন। কুঞ্জদ্বারে বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট শুক ও সারী এই লীলার মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছে—

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
সারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
নৈলে শুধুই মদন।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
সারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নৈলে পারবে কেন?

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা,
সারী বলে, আমার রাধার নামটি তাতে লেখা,
ঐ যে যায়গো দেখা।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে
সারী বলে, আমার রাধার চরণ পাবে বলে,
চূড়া তাইতে হেলে।

বৈষ্ণব কবিগণ নিজদিগকে এই লীলা বর্ণনাকারী শুকের সঙ্গে তুলনা করিয়া গভীর আনন্দ অনুভব করিতেন। রাধা ও কৃষ্ণ তাঁহাদের জীবন সর্বস্ব ছিলেন। এই লীলায় অংশ গ্রহণ করিতে স্বভাবতই তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল। লীলাবর্ণনাও লীলায় অংশ গ্রহণের অঙ্গ। তাই তাঁহাদের একমাত্র কামনা—

হরি হরি, হেন দিন হইবে আমার।
দুহুঁ-অঙ্গ পরশিব দুহুঁ-অঙ্গ নিরখিব
সেবন করিব দোঁহাকার॥

ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করির রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কণক-সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল পূরি
যোগাইব অধর যুগলে ॥
রাধা-কৃষ্ণ বৃন্দাবন সেই মোর প্রাণধন
সেই মোর জীবন উপায়।
জয় পতিত-পাবন দেহ মোরে এই ধন
তোমা বিনে অন্য নাহি ভায় ॥

বৈষ্ণব কবিরা তাঁহাদের এই ঈপ্সিত কর্তব্য আশাতীত সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। রাধা-কৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমলীলা মানস-নয়নে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা তাঁহাদের রচিত পদাবলীকে কালজয়ী করিয়া যাইতে পারিয়াছেন।

বৈষ্ণব কবিতার মানবিক আবেদন

বৈষ্ণব কবিতা—লৌকিক হইতে অলৌকিকের পথে যাত্রা; স্বর্গ ও পৃথিবীর সমন্বয়; দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।]

বৈষ্ণব কবিতায় রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রেমলীলা মানবিক প্রেমের আধারেই বিধৃত। বিরহ-মিলন-কথায় পরিপূর্ণ বৈষ্ণব পদগুলি স্বভাবতঃই আমাদিগকে মানুষী প্রেমের কথাই মনে করাইয়া দেয়। কিন্তু বৈষ্ণব শাস্ত্রকারেরা রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-গীতিকে মানবীয় প্রেমগীতি বলিয়া গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মর্তের মানবিক প্রেম শুদ্ধ প্রেম নহে, উহা কাম ও দেহবুদ্ধিযুক্ত। উহাতে স্বার্থহীনতার ভাবটিও দেখিতে পাওয়া যায় না।

বৈষ্ণব শাস্ত্রকারদের মতে বৈষ্ণব কবিতা বৈষ্ণব তত্ত্বেরই রসভাষ্য। বৈষ্ণবীয় তত্ত্বই বৈষ্ণব কবিতায় রূপ লাভ করিয়াছে। এই তত্ত্বটিকে

বাদ দিয়া বৈষ্ণব পদাবলীকে শুধুমাত্র সাধারণ নরনারীর প্রেমকাহিনীর অনুরূপ অথবা প্রতিরূপ বলিয়া গ্রহণ করিলে চলিবে না। সচ্চিদানন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আনন্দাংশ দ্বারা সৃষ্ট জীবের প্রতীক শ্রীরাধার সঙ্গে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন ধামে লীলায় রত। ভক্ত এই লীলা মানস-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দরসে নিমজ্জিত হইবেন ইহাই হইল বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব। ভগবানের আনন্দাংশের মানবীরূপ হইতেছেন ললিতা-বিশাখা-চন্দ্রাবলী-রাধা। তবে আনন্দাংশের বা আহ্লাদিনীর সার অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণতম প্রকাশ রাধিকা। একদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অপরদিকে তাঁহার আনন্দাংশের মানবীরূপ চিরযৌবনসম্পন্না রাধার মধ্যে নিত্য প্রেমলীলা চলিতেছে। বৈষ্ণব কবিরা এই লীলাকে তাঁহাদের কাব্যে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রীরাধা ভগবানেরই প্রেম-রসমূর্তি। তত্ত্বতঃ রাধা ও কৃষ্ণ এক। ভগবান আপন আহ্লাদিনী শক্তির দ্বারা আপনাকে আপনি আস্বাদন করেন। কাজেই এখানে কামের কোন কথা আসিতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন গড়িয়া উঠিল এবং রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমলীলা চৈতন্যদেবের জীবনে মূর্ত হইয়া দেখা দিল। 'শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে রাধার বিরহ-ব্যথা জীবন্তভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার উজ্জ্বল দেহকান্তি শ্রীরাধিকার অনুরূপ ছিল। তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমও শ্রীরাধার তন্ময়তা স্মরণ করাইয়া দিত। এই রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত নবীন সন্ন্যাসী প্রেমের বন্যায় সারা বঙ্গদেশ ভাসাইয়াছিলেন। সেই প্রেমসিন্ধু হইতেই পদাবলীরূপ কৌস্তুভমণির উদ্ভব'। প্রেমের এই জীবন্ত মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া বা কবি-মানসে রাখিয়া বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমগীতিহার রচনা করিয়াছেন। কাজেই বৈষ্ণব কবিতাকে সাধারণ নরনারীর প্রেম বলিয়া গ্রহণ করা চলে না।

কিন্তু বৈষ্ণব কবিতায় প্রেমের এমন উজ্জল প্রকাশ ঘটিয়াছে যাহা আমাদিগকে আমাদের এই কান্নাহাসি বিজড়িত ধরিত্রীর প্রেমের কথাই মনে করাইয়া দেয়। কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া রাধার আকুলতা, নায়ক-নায়িকার মিলন পূর্বক দর্শন ও শ্রবণ হইতে জাত প্রগাঢ় অনুরক্তি, প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য রাধার অভিসারে যাত্রা প্রভৃতি বিষয় বৈষ্ণব কবিরা এমন জীবন্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহা আমাদিগকে ঘরের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। তাই আমাদের মনে সংশয় জাগে যে, এই উজ্জল প্রেমের সঙ্গে কি ধরণীর কোনই সম্পর্ক নাই? কারণ দেবতার উদ্দেশ্যে বৈষ্ণব কবিরা যে-প্রেমগীতি উপহার দিয়াছেন তাহার মধ্যে ধরণীর প্রেমতৃষিত নরনারীর স্নিগ্ধ সুকুমার মুখচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিয়াছেন—

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?
পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন,
বৃন্দাবন-গাথা,—এই প্রণয়-স্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
শরমে সম্ভ্রমে,—একি শুধু দেবতার।

তাহা তো মনে হয় না। কবির মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে বৈষ্ণব কবি নিশ্চয়ই বাস্তব জগতের প্রিয়াকে সম্মুখে রাখিয়া এই প্রেমহার রচনা করিয়াছেন,—

হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।
বিজন বসন্তরাতে মিলন-শয়নে

কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি। এত প্রেমকথা
রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার আঁখি হতে।

আমরা যাহাকে ভালবাসি তাহাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ নিবেদন করি। কাজেই যাহাকে ভালবাসি তাহারই মধ্য দিয়া যদি দেবতার সেবা করি তবে অপরাধ কোথায়? নরনারীর যে-প্রেম তাহাই তো পরম বস্তু। প্রেমিকের প্রতি প্রেম নিবেদনের মধ্য দিয়াই কি ঈশ্বরের প্রতি প্রেম নিবেদন করা হইতেছে না?

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

কিন্তু বৈষ্ণব শাস্ত্রকারেরা ইহা মানিতে চান না। তাঁহাদের মতে দেহবুদ্ধি-সম্পৃক্ত মানবিক প্রেম কখনও অলৌকিক প্রেমের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতা যেভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলাকে বাস্তবানুগভাবে বর্ণনা করিয়াছে তাহাতে ইহাকে আমরা কিছুতেই এই পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত বলিয়া ভাবিতে পারি না। বৃন্তহীন কুসুম যেমন অকল্পনীয় তেমনি বৈষ্ণব কবিতাকে ধরণীর সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত অলৌকিক গোলোকধামের বস্তু বলিয়া চিন্তা করা অসম্ভব। আসলে 'যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা, প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে। বৈষ্ণব

ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে।'

অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, লৌকিকের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলেও বৈষ্ণব কবিতা নিঃসন্দেহে আমাদের মনে অলৌকিকের আবেদন আনিয়া দেয়। বৈষ্ণব কবিতার যদি কোন উদ্দেশ্য থাকিয়া থাকে, তবে সেই অলৌকিক রসস্বরূপ পরম পুরুষের অনুভূতি আমাদের মনে জাগ্রত করিয়া দেওয়াই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। রাধাকৃষ্ণের প্রেম মানবিক প্রেমের আধারে রচিত হইলেও তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো যায় না। সেই প্রেমের অনুভূতি যাহার মনে জাগ্রত হইয়াছে এই জগৎ সংসার তাহার কাছে মিথ্যা হইয়া যায়। তাই তো রাধা বলেন—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল॥

কাজেই দেহসর্বস্বতার সঙ্গে বৈষ্ণব কবিতার কোন সম্পর্ক নাই। তবে ইহা নিরলম্ব দেহাতীত নয়। সত্যই 'বৈষ্ণব কবিতা সমুদ্রগামী নদীর ন্যায়। নদী চলিয়াছে, দুই দিকে তটভূমি, তাহা আনন্দ-

কলরবে মুখরিত হইয়া নদী চলিতেছে; দুই ধারে ফল-ফুল সমন্বিত তরুলতা, জন-কোলাহল, পল্লীর অপূর্ব সৌন্দর্য ফুলের বাগান। কিন্তু যখন নদী মোহনায় আসিল, তখন সে-সমস্ত দৃশ্য সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে, আর সে বিহগ-কূজিত, জন-কোলাহল-মুখরিত, উদ্যান-সঙ্কুল বনভূমি—এ সকলের কিছু নাই—সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মত অসীমের প্রতীক মহাসমুদ্র। বৈষ্ণব কবিতা নানারূপ পার্থিব সৌন্দর্যের পথ বাহিয়া চলিয়াছে—কিন্তু তাহার পরম লক্ষ্য সেই অজ্ঞেয় দুরধিগম্য মহাসত্য।' সীমা ও অসীমের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া বৈষ্ণব কবিতা আমাদের মনে অপার রহস্যলোকের সন্ধান আনিয়া দেয়। পৃথিবীর কল-কোলাহলের মধ্যে তাহার যাত্রা আরম্ভ। ক্রমশঃ সেই কোলাহল শান্ত হইয়া আসিতে থাকে; সীমার অতীত অসীমের অস্পষ্ট আভাষ আমরা পাইতে থাকি। বৈষ্ণব কবিতা সেই অস্পষ্টতাকেই স্পষ্ট করিবার সাধনা করে। সেইখানেই বৈষ্ণব কবিগণের বৈশিষ্ট্য। 'কবিরা পৃথিবী আঁকিয়াছেন এবং স্বর্গও আঁকিয়াছেন—কিন্তু বৈষ্ণব কবিরা পৃথিবী ও স্বর্গ এক করিয়া দেখাইয়াছেন—তাঁহাদের আঁকা ছবি যে সত্য, চৈতন্যদেবই তাহারই প্রমাণ।'

বৈষ্ণবকাব্যে মিষ্টিসিজম্—অন্তর্নিহিত অথবা আরোপিত

১

মিষ্টিসিজমের সংজ্ঞাটি নিরূপণ করা বড় সহজসাধ্য নয়। তাহার কারণ মিষ্টিসিজমের সঙ্গে একটি অস্পষ্টতা অনিবার্যভাবে জড়াইয়া আছে। মিষ্টিসিজমের দার্শনিক ও ধর্মীয় এই দুইটি দিক আছে; এবং

দর্শন ও ধর্মের মর্ম শুধুমাত্র বোধিদৃষ্টি সম্পন্ন অনুভূতিপ্রবণ মনের কাছে স্পষ্ট হইয়া ওঠে। অন্যের কাছে ইহারা শুধু তর্কের ধূম্রজাল সৃষ্টি করে।

মিষ্টিসিজম বস্তুটি কি? কবি এবং সাধক, কোন কোন ক্ষেত্রে দার্শনিকেরাও বটে, কল্পনা করেন যে, এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে একটি সত্তা আছে। এই যে স্বর্ণাভ সূর্যাস্ত, উত্তুঙ্গ গিরিচূড়া, গভীর অরণ্যানী অথবা নিঃসঙ্গ মরুপ্রান্তর ইহারা সেই সত্যের ইঙ্গিত প্রতিনিয়ত বহন করিতেছে। সমগ্র জগৎ যেন প্রতীকরূপে সেই শাশ্বত সত্তার প্রতি চক্ষুষ্মান মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু শুধুমাত্র মরমী মনের কাছেই সেই ইঙ্গিতের অর্থ সুস্পষ্ট হয়। কারণ সেই আবেদন মোটেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। প্রজ্ঞা বা মেধাদ্বারা তাহাকে উপলব্ধি করা যাইবে না। শুধু তীব্র অনুভূতি বা বোধিদ্বারাই সেই অরূপের রূপ সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। তাহাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনা যায় না, তাহাকে ব্যক্ত করাও যায় না অথচ সে নিকটতম প্রতিবেশী—

> আমার বাড়ীর পাশে আরশী নগর
> সেথায় এক পড়শী বসতি করে
> আমি নাম জানি না তার।

যে-অখণ্ড বোধিদৃষ্টির (intuition) সাহায্যে কবি বা ভক্ত পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালবর্তী পরম সত্যকে উপলব্ধি করিয়া তাহার সঙ্গে এক অবিচ্ছিন্ন একাত্মতা লাভ করেন এবং নিরবধি আনন্দের স্রোতে প্রবহমান থাকেন সেই বোধি-দৃষ্টিকে বা ভক্তের সেই সত্যদৃষ্টি লাভের সাধনাকে আমরা মিষ্টিসিজম নামে অভিহিত করিতে পারি। অর্থাৎ যে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হইলে মানুষ সীমিত ব্যক্তিসত্তার আড়ালে অসীম প্রাণসত্তাকে আবিষ্কার করিতে পারে, এক কণা বালুকার মধ্যেও নিখিল বিশ্বলোকের প্রতিচ্ছবি ধরিয়া রাখিতে পারে

কিম্বা একটি মুহূর্তের মধ্যে অনন্ত মুহূর্তের তীব্র অতৃপ্তি খুঁজিয়া পাইতে পারে সেই অত্যদ্ভুত অনুভূতিকেই মোটামুটিভাবে মিষ্টিক চেতনা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। বলা বাহুল্য ইহা কোন মতবাদ নয়, শুধু অনুভূতি মাত্র। তাই ইহার সংজ্ঞা বেশী স্পষ্ট করা সম্ভব নয়।

মিষ্টিক কবির ধ্যানদৃষ্টিতে বাহিরের এবং অন্তরের দুইটি জগৎ এক পরম ঐক্যে বিধৃত হইয়া দিব্যানুভূতির আলোকে নিত্য উদ্ভাসিত। তাঁহাদের কাব্যের মধ্যে তাই অনির্দেশ্য বিস্ময় ব্যাকুলতা অথবা বেদনার সুর-মূর্ছনা ধ্বনিত হইয়া ওঠে না, অতৃপ্তির হাহাকারও তাঁহাদের কাব্যকে অকারণে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে না বরং সমাহিত, শান্ত, স্নিগ্ধ এক সত্যের জ্যোতি বিকিরণে কবির চিত্ত সহসা আলোকিত হইয়া ওঠে। কবি তখন—'In the position of a man who, in a world of blindmen, has suddenly been granted sight, who gazing at the sun-rise, overwhelmed by the glory of it, tries however faultingly, to convey to his fellows what he sees.' কবির কাছে ইহাই তো পরম মুহূর্ত।

কবি তখন প্রকাশ করিতে চান, আপন উপলব্ধিকে ভাষার শৃঙ্খলে রূপদান করিতে চান কিন্তু পারেন না। কারণ সেই সত্য তখন—

সে শুধু পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়
ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে।

তিনি উপলব্ধি করেন—সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি।

সেই অনির্বচনীয় সুর হৃদয়ের নিভৃতে নিত্য ধ্বনিত হইতে থাকে, তাহাকে শোনা যায় কিন্তু চেনা যায় না—তাহাকে উপলব্ধি করা যায়

কিন্তু প্রকাশ করা যায় না ; কবি তাহার প্রহেলিকাময় মায়াডোরে বাধা পড়েন, যদিও তাঁহার অনুভূতির মধ্যে অস্পষ্টতা নাই। কারণ—

And I have felt
A presence.
A motion and a spirit, that impels
All thinking things, all objects of all thought,
And rolls through all things.

ইংরেজ কবি ব্লেক এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ (খেয়া) প্রভৃতি কবিবৃন্দ, বাউল এবং সুফী মতাবলম্বী ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধকবৃন্দের মধ্যে এই দৃষ্টির চরম বিকাশ আমরা লক্ষ্য করিতে পারি।

২

বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে অনিবার্য কারণেই মিষ্টিসিজমের প্রশ্নটি আসিয়া পড়ে। ইহার মূলে রহিয়াছে বৈষ্ণব সাধকদের সেই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী যাহার বলে তাঁহারা লীলাময় ঈশ্বরকে জীবের সঙ্গে অহর্নিশি প্রেমলীলায় বিভোর থাকিতে দেখিতে পান। অর্থাৎ সেই পরম সত্তার নিত্য উপলব্ধি, নিত্য তাঁহার প্রেমময় পরশ তাঁহারা অনুভব করেন। সেই পরম সত্য —উপনিষদে যিনি ব্রহ্ম, যোগীর নিকট যিনি পরমাত্মা, বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে তিনিই ভগবান। বৈষ্ণবেরা এই ভগবানের আনন্দময় সত্তার উপাসক। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, আনন্দময় ঈশ্বর লীলারস আস্বাদনের জন্য দ্বিধাবিভক্ত হইলেন—পতি ও পত্নীরূপে, পরমাত্মা ও জীবাত্মারূপে। পতি হইতেছেন মহাপুরুষ কৃষ্ণ বা পরমাত্মা, পত্নী পরমাপ্রকৃতি শ্রীরাধিকা বা জীবাত্মা। রাধাভাবে ভাবিত জীবাত্মা পরমাত্মা কৃষ্ণের সহিত যখন অন্তর্বৃন্দাবনে প্রেমবিলাস করেন তখন এই দ্বৈতভাব তিরোহিত হয়, আর মূলতঃ তাঁহাদের মধ্যে বিভেদও নাই। 'প্রিয়া স্ত্রীর দ্বারা আলিঙ্গিত

পুরুষের যেমন বাহ্য বা আন্তর জ্ঞান থাকে না, প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা আলিঙ্গিত পরমাত্মার তেমনই বাহ্য বা আন্তর কোনও ভেদজ্ঞান থাকে না'। এ অবস্থায় কামনার যেমন চরম প্রাপ্তি, তেমনই আবার সর্বকামনার শেষ। বৈষ্ণবের প্রেমের শেষ সীমা হইতেছে—

না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥

কৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গদেব ছিলেন মহাভাবময়ী শ্রীরাধার মূর্তপ্রতীক। তাই তাঁহাকে 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ' বলা হয়। রাধার রাগের আনুগত্যময়ী প্রেমসাধনায়, রাধার সহিত নিরবচ্ছিন্ন মানস সান্নিধ্যের ফলে গৌরচন্দ্র রাধার ভাব-সুরভিতে সুরভিত, ভাবরসে রসায়িত হইয়াছিলেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে সৃষ্টির উষাকাল হইতে জীবের সঙ্গে প্রেমময় ঈশ্বরের যে-লীলা চলিয়াছে, বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ তাহারই রূপক আবরণ; এবং এই পতি-পত্নী সম্পর্কটির সঙ্গে অনিবার্যভাবেই কামের প্রশ্নটি আসিয়া পড়ে। কাম গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধনাতে স্বীকৃত, কিন্তু দেহস্পর্শহীন নির্মল ভাবমাত্রে রূপান্তরিত—

রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
কামগন্ধ নাহি তায়।

ভাববৃন্দাবনে কান্ত কৃষ্ণের সঙ্গে কান্তারূপ ভক্তের বিপ্রলম্ভ (পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, আক্ষেপানুরাগ, প্রবাস ইত্যাদি) সম্ভোগাত্মক নিরবচ্ছিন্ন প্রেমানন্দই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের একমাত্র কাম্য।

বৈষ্ণব কবিরা আবার বাধাবন্ধহীন তীব্র অনুরাগের প্রতীকরূপে পরকীয়াবাদকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরকীয়ারাগের প্রেক্ষাপটে তাঁহারা শ্রীরাধার অপূর্ব মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। পূর্বরাগে প্রথম মধুর-রতির প্রকাশ। তাহার পর অনুরাগ, আক্ষেপানুরাগ, অভিসার

ইত্যাদি নানা অবস্থার ভিতর দিয়া 'ভাব সম্মিলন'-এ রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা সমাপ্ত। এই ভাবসম্মিলন প্রকৃতপক্ষে মহামিলন—জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীভূত হওয়া 'Self-mergence in the principle of Love and Life.' ইহাই হইল নিত্যকালের মিলন। দ্বৈতবাদে যে প্রেমলীলার সূচনা অদ্বৈততত্ত্বে তাহার পরিসমাপ্তি।

রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার রূপক মিষ্টিসিজমের ইঙ্গিত বহন করিতেছে। কারণ মিষ্টিকের উপলব্ধি অনুভূতিগ্রাহ্য বলিয়া তাহাকে প্রকাশ করিতে হইলে অনিবার্যভাবেই রূপবন্ধ, উপমা, রূপক ও প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই সকলের সাহায্যে ভাবুক, প্রেমমুগ্ধ কবি অবাঙ্-মানসগোচর সেই সত্তাকে গোধূলির রহস্যাচ্ছন্ন আলোকে ম্লান এক 'আলো-আঁধারি' ভাষায় প্রকাশ করিতে চান। বৈষ্ণব কবির মধ্যেও আমরা ভাষার এই রহস্যময়তা লক্ষ্য করিতে পারি।

রাধাকৃষ্ণের অলৌকিক প্রেমলীলার গাঢ়তা ও গূঢ়তা প্রকাশের ভাষা মানব-কবিজন বোধ হয় সর্বদা খুঁজিয়া পান নাই। তাঁহারা ব্রজবুলির সুললিত আধারে, অপরূপ অলঙ্কার ও ছন্দের বন্ধনে যাহাকে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন সে প্রেম এতই মহৎ, এতই উদার, এতই তীব্র এবং দুর্জ্ঞেয় যে তাহাকে সম্যক প্রকাশ করা তাঁহাদের খুবই দুরূহ বলিয়া মনে হইল। তাই আভাষে, ইঙ্গিতে, তাঁহারা এই প্রেমকে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু ব্রজবুলির কৃত্রিমতার মধ্যে ততটা ব্যক্ত হয় নাই। কারণ এই কৃত্রিম ভাষা মর্মের গভীরতা প্রকাশের অনুকূল ছিল না। বৈষ্ণব কবির ভাষা যে আত্মার ভাষা। তাই মিষ্টিক বৈভব চণ্ডীদাসের সহজ-স্নিগ্ধ প্রেমকলায় যতটা ফুটিয়া উঠিয়াছিল অন্যান্য কবির অলঙ্কারের তীব্রচ্ছটায় তাহা ততটা রূপলাভ করিতে পারে নাই। তথাপি মাঝে মাঝে বিচিত্র, ভাবগম্ভীর প্রেম-মনস্তত্ত্বের উদ্ঘাটনে বৈষ্ণব পদাবলীকারগণ যে অপরূপ অথচ দুর্জ্ঞেয় উপলব্ধির

স্বাক্ষর রাখিয়াছেন, যে মিষ্টিক অনুভূতির পরিচয় দিয়াছেন তাহা এক কথায় অভিনব। বৈষ্ণব কবিতা 'বৈকুণ্ঠের তরেই' যে রচিত হয় নাই—মানব এবং দেবের সেতুবন্ধেই যে তাহার উৎপত্তি ইহা আমরা অনায়াসেই লক্ষ্য করিতে পারি। তাঁহারা লৌকিক নর-নারীর জীবনে যে প্রেম দেখিয়াছিলেন তাহাই অলৌকিক রসাবেশে অমরতুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন এক তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে। সেই তত্ত্ব জটিল ঐশী-উপলব্ধির সারভূত হইলেও প্রতিষ্ঠিত ছিল অখণ্ড ভক্তি তথা প্রেম চেতনার উপর। তাই বৈষ্ণব কবিতা 'নানারূপ পার্থিব সৌন্দর্যের পথ বাহিয়া' শেষ পর্যন্ত এক 'অজ্ঞেয় দুরধিগম্য মহাসত্যের' প্রতিই ইঙ্গিত করিত; এবং সেই ইঙ্গিতের আলোকে রূপ এবং অরূপ, অন্তর এবং বাহির, সীমা এবং অসীম সব কিছুই একাকার হইয়া যাইত।

অধিকাংশ বৈষ্ণব পদেই তাই বিশ্বনিয়ন্তা আনন্দময় পুরুষপ্রবরের বাঁশীর সুরে, এই মিষ্টিক চৈতন্যবাণী আমরা ধ্বনিত হইতে শুনিয়াছি। এই সুর নানাপদে নানাভাবে বাজিয়াছে। স্থান-কাল-পাত্রের ব্যবধান—দেহের সীমা লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রেম কখনো সমস্ত বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত হইয়াছে—কখনো চরম উপলব্ধির মাহেন্দ্রক্ষণে দয়িতা আপনার সত্তাকে প্রেমিকের কাছে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়াও তৃপ্তি পায় নাই, শেষ পর্যন্ত তাহারই সঙ্গে একাত্ম হইতে চাহিয়াছে। আপন হৃদয়ের ঐশ্বর্য নিঃশেষে বিতরণ করিয়াও পদাবলীর রাধার তৃপ্তি নাই—বাহ্য সচেতনতাবিহীন হইয়া ঐকান্তিক আত্মিকতায় তিনি সদাধ্যানস্থা।

বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥

এই যোগিনী রাধা কৃষ্ণ-রূপ-মাধুরী আস্বাদন করিয়াছেন বনের তমালশ্রীতে, যমুনার জলোচ্ছাসে, ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠের সুচিক্কণতায়। চণ্ডীদাস যখন নিবেদিতা রাধার মুখ দিয়া—

জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয়ো তুমি ॥

—এই বাসনা ব্যক্ত করাইলেন তখন এক মহাসত্তার সঙ্গে অনাদ্যন্ত কাল ধরিয়া মিলিত থাকিবার অঙ্গীকারই বুঝি আমরা শুনিয়াছি। আবার যখন শুনি—

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেল ॥

তখন সীমিত দেহের উর্ধ্বে এক নিরলম্ব সৌন্দর্য-নির্যাস-সিক্ত প্রেম ভাবনাই আমাদের মনকে উতলা করিয়া তোলে। রাধা যখন উপলব্ধি করেন—

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥
রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥

এবং পরিণামে কৃষ্ণ যখন তাহার—

হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল ॥
দেহক সরবস গেহক সার।
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার ॥

হইয়া ওঠেন তখন আমাদের বুঝিতে আর বাকী থাকে না যে, বৈষ্ণব-পদাবলী সসীম ও অসীমের সন্ধিস্থলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এক অফুরন্ত রহস্য-লোকের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে চায়। স্থাণু ও নির্বিশেষ পুরুষের উদ্দেশ্যে জঙ্গমা প্রকৃতির অভিসার বারংবার নানাভাবে, নানাবেশে, নানা ভাবনায় ইহার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার 'অভিসার' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ একাত্ম হইবার যে মিষ্টিক

প্রেরণাকে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই বৈষ্ণবতত্ত্বেরই রসভাষ্য। সেই কবিতার শেষ কথা—

বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারের চলা
পদে পদে মিলেছে একতানে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে
সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে।

বৈষ্ণব মহাজন সেই 'খেয়া' পাড়ি দিয়া মিষ্টিক-প্রেমকে চরমোৎকর্ষের অমরলোকে উন্নীত করিয়া দিয়াছেন।

৩

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বৈষ্ণব পদাবলীকারগণ যতই মিষ্টিক চেতনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন না কেন মূলতঃ তাঁহারা ছিলেন তত্ত্বের অনুশাসনে কঠোরভাবে আবদ্ধ। হৃদয়াবেগের স্বতস্ফূর্ত উচ্ছাসকে প্রায়শই সেই তত্ত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিতে হইত। যে গোষ্ঠীচেতনা হইতে পদাবলী সাহিত্য উদ্ভূত তাহার কোন অনুশাসন, কোন বিধি, কোন আচারকে, উপকরণের কোন অংশকে অবহেলা করিবার কোন অধিকার কবিজনের ছিল না।

বৈষ্ণবকাব্য ভক্তের হৃদয়-বিলসন মাত্র নহে, উহা সাধনার ইতিহাস। রাধাকৃষ্ণ লীলা তদ্‌গতচিত্তে লীলাশুকের ন্যায় আস্বাদন করাই বৈষ্ণব মহাজনগণের একান্ত কাম্য। কবিগণ লৌকিক প্রেমকলার অভ্যন্তরে লোকাতীত যে তত্ত্বের প্রচার করিতেন তাহা গোষ্ঠীচেতনার অনুকূল ছিল বটে কিন্তু সর্বদা কবিত্বশক্তির অনুগামী ছিল না। সচ্চিদানন্দের লীলাবিলাসকে সুপরিস্ফুট করিবার অভিলাষ লইয়াই কবিরা পদাবলী রচনা করিতেন। নির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক-তত্ত্বের ভূমিকা তাই অপরিহার্যরূপেই তাহার সঙ্গে যুক্ত হইত। সে ভূমিকা যত আরোপিত ছিল ততটা অন্তর্নিহিত ছিল না।

কিন্তু তথাপি বৈষ্ণবকাব্যের রসবৈচিত্রী ও কাব্যমূল্য সর্বজনবিদিত। কারণ কৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া বিশিষ্ট ধর্মনৈতিক চেতনায় সাহিত্য সৃষ্টি করিলেও তাঁহারা কেবলমাত্র ভক্তিরসিকই ছিলেন না, কাব্যরসিকও ছিলেন। কলাকুতূহলী 'উজ্জ্বলনীলমণি'-কার হইতে আরম্ভ করিয়া নগণ্যতম মহাজন পর্যন্ত সকলেই প্রেমের শাশ্বত অথচ ক্ষণমুহূর্তলীন, বহুভুক্ত অথচ দুর্জ্ঞেয় অনুভূতিগুলিকে বিশেষভাবে চিনিতেন। পাঠকের চিরন্তন রুচি ও সংস্কারের যে স্থির মাপ-কাঠি আছে তাহার বিচারেও তাঁহাদের কাব্য বহু ক্ষেত্রে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। এমনকি গূঢ় আধ্যাত্মিকতার ব্যঞ্জনায় লোকাতীত উচ্চগ্রামের প্রেমদর্শনে পদাবলীতে যে অনির্বচনীয় রসসঞ্চার ঘটিয়াছিল তাহার আস্বাদ্যমানতাও 'সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী' পরিবেশ সৃষ্টির অনুকূল ছিল। তথাপি এই নিগূঢ়তম রসর্চনা কতখানি অকৃত্রিম ছিল তাহা আজ চিন্তা করিবার বিষয়। যে অনুকূল পরিবেশে রোমান্টিকতার মুকুল ধীরে ধীরে মিষ্টিক চেতনায় বিকশিত হইয়া ওঠে সেইরূপ মানসিক সংস্থান স্তূপীকৃত তত্ত্ববস্তুর প্রচারে সম্ভব কিনা তাহাও বিচার্য। যে অকৃত্রিম, বন্ধনহীন হৃদয়াবেগ মিষ্টিক কবিকে অধিচেতন জগতের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাইয়া দেয়, যে বিবেক কবিকে স্বীয় বোধির আলোকে পথ দেখাইয়া অসীমের দুর্জ্ঞেয় রহস্যলোকে নীত করে তাহা মহাজনগণ কতটা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন তাহা বুঝিবার উপায় নাই। যে বিশিষ্ট 'জীবাত্মা-পরমাত্মা' তত্ত্ব সমগ্র পদাবলী কাব্যকে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে, যে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা তত্ত্বের উপর রসের আচ্ছাদন দিয়াছে, তাহা এতই পূর্বনির্ধারিত ছিল যে, তাহার মধ্যে কবিত্বশক্তি বিকাশের সুযোগ থাকিলেও মিষ্টিক চেতনা পরিচর্যার কতটা অবসর ছিল তাহা বলা শক্ত।

বৈষ্ণব কাব্যের ছন্দ ও অলঙ্কার

বৈষ্ণব কবিতা নানাদিক দিয়াই বাঙ্গলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এই কবিতার ভাব ও অলৌকিক আবেদন সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা যে শুধু ভাবের দিক হইতেই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এমন নহে ; ছন্দ, অলঙ্কার ও প্রকাশ-বৈচিত্র্যের দিক হইতেও ইহার চমৎকৃতি অনস্বীকার্য। বৈষ্ণব কবিরা সকলেই সুপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ছন্দ ও অলঙ্কার-শাস্ত্রের সঙ্গে প্রত্যেকেরই গভীর পরিচয় ছিল। সেই অভিজ্ঞতা তাঁহারা তাঁহাদের রচিত পদসমূহে কাজে লাগাইয়াছেন।

বৈষ্ণব পদাবলী ছন্দ, অলঙ্কার, ভাষা ও ভঙ্গী—প্রায় প্রত্যেক দিক দিয়াই একক মহিমায় ভাস্বর। অন্যান্য কবিরা তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছেন। পদাবলীর প্রধান ছন্দ মাত্রাবৃত্ত, কারণ পদাবলী সবই গান। চার মাত্রা হইতে আট মাত্রা পর্যন্ত পর্ব (কোন কোন সময় চরণে অপূর্ণপদী পর্ব) লইয়া চরণগুলি গঠিত হইয়াছে। পদাবলীর এই ছন্দকে পজ্ঝটিকাও বলা হয়—যাহা হইতে পরে পয়ারের জন্ম হইয়াছে।

চার মাত্রার পর্ব (শেষ পর্বটি অপূর্ণ পদী)—

দিনে দিনে | উন্নত | পয়োধর | পীন।
বাঢ়ল | নিতম্ব | মাঝ ভেল | খীন॥

সাত মাত্রার পর্ব (ঐ)---

এ সখি হমারি | দুখের নাহিক | ওর।
ই ভরা বাদর | মাহ ভাদর | শূন্য মন্দির | মোর॥

প্রথম চরণ তিন পর্বিক, দ্বিতীয় চরণ চতুষ্পর্বিক।

পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দেরও প্রয়োগ বৈষ্ণব কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহ কাজে।
নিশিদিশি কাঁদি তবু হাসি লোক লাজে॥ (পয়ার)

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥ (ত্রিপদী)

বৈষ্ণব পদকর্তারা গীতগোবিন্দের ছন্দ (বৃত্তছন্দ, জাতিছন্দ ও অপভ্রংশের ছন্দ) এবং বিদ্যাপতির পজ্ঝটিকা ছন্দকেই প্রধানতঃ অনুসরণ করিয়াছেন। এ সকল ছন্দের লক্ষণ প্রাকৃতপিঙ্গল-সূত্রে দেওয়া আছে। ছন্দের এই বৈচিত্র্যময় প্রয়োগে পদাবলী সাহিত্য নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

পদাবলী সাহিত্য অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগে অতিশয় সমুজ্জ্বল হইয়াছে। ছন্দের মত পদাবলীর অলঙ্কারের রাজাও বিদ্যাপতি। অনুপ্রাস, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত, সমাসোক্তি, নিদর্শনা, অর্থান্তরন্যাস, বিষমালঙ্কার প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক প্রকারের অলঙ্কারের প্রয়োগ পদাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির মত গোবিন্দদাসও অলঙ্কার প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের পদগুলি অপেক্ষাকৃত বিরলবর্ণ হইলেও ভাবের গভীরতায় সেইগুলি বিশেষ সমৃদ্ধ এবং তাহাতে উপরিউক্ত অলঙ্কারেরও একেবারে অসদ্ভাব নাই। পদাবলীর কয়েকটি অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।—

রূপক—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকসিত ভাবকদম্ব॥

অথবা,

হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥

অনুপ্রাস—

মঞ্জু বিকচ কুসুম-পুঞ্জ
মধুপ-লুব্ধ গুঞ্জি গুঞ্জ
কুঞ্জর-গতি গঞ্জি গমন
মঞ্জুল কুলনারী।

অতিশয়োক্তি—

কোমল চরণ চলত অতি মন্থর
উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি-পঙ্কজ
দুহুঁ পাদুক করি নেল॥

উপমা—

তাতল সৈকতে বারি-বিন্দু সম
সুতমিত রমণী-সমাজে।

উৎপ্রেক্ষা—

লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধুমাতল কিয়ে উড়ই না পার।

এই সকল অলঙ্কার প্রয়োগের ফলে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রকাশ-বৈচিত্র্যও মনোরম হইয়া উঠিয়াছে।

কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য

সংস্কৃতে রচিত শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবদের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব হইতেই এই গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই অনুবাদ-কার্য চলে। বাঙ্গলায় অনূদিত ভাগবতের একটি তালিকা দেওয়া হইল—

১। মালাধর বসু—শ্রীকৃষ্ণ বিজয় (ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ নহে। অবশ্য কোনটিই ভাগবতের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ নহে)। ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়।

২। মাধব আচার্য—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (১৬শ শতাব্দী)

৩। কৃষ্ণদাস—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (”)

৪। দুঃখী শ্যামদাস—গোবিন্দ মঙ্গল (”)

৫। রঘুনাথ পণ্ডিত—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী (”)

৬। কবিশেখর (দৈবকীনন্দন)—গোপাল বিজয় (রচনা কাল অজ্ঞাত—তবে ১৬শ শতাব্দী বলিয়াই মনে হয়)

৭। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর—শ্রীকৃষ্ণবিলাস (১৬শ শতাব্দী)

৮। পরমানন্দ—ভাগবত (”)

৯। কালিদাস—শ্রীকৃষ্ণলীলা (”)

১০। ভবানন্দ—হরিবংশ (১৭শ শতাব্দী)

১১। বলরামদাস—কৃষ্ণলীলামৃত (১৮শ শতাব্দী)

১২। দ্বিজ রমানাথ—শ্রীকৃষ্ণ বিজয় (”)

১৩। কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী— গাবিন্দমঙ্গল (”)

১৪। দ্বিজ মাধবেন্দ্র—ভাগবতসার (”)

এইগুলি ছাড়াও ভাগবত অবলম্বনে রচিত আরও অনেক পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তবে সেইগুলি একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য।

চৈতন্য-জীবনী কাব্য

চৈতন্যদেবের পুণ্য জীবন-কাহিনী অবলম্বন করিয়া মধ্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্যে অনেকগুলি চরিতগ্রন্থ রচিত হয়। বাঙ্গলা সাহিত্যে চরিতশাখার এই সংযোজন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই কাব্যগুলি হইতে তৎকালীন বঙ্গদেশের অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। এই গ্রন্থগুলি বৈষ্ণবদের পরম আদরের সামগ্রী।

১। বৃন্দাবন দাস—চৈতন্য ভাগবত—(১৬শ শতাব্দী)

২। গোবিন্দদাস—কড়চা—(এই বইখানির মৌলিকত্ব সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান)

৩। লোচনদাস—চৈতন্যমঙ্গল—(১৬শ শতাব্দী)

৪। জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল— (")

৫। কৃষ্ণদাস কবিরাজ—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত („—শ্রেষ্ঠ চৈতন্য চরিত গ্রন্থ)। সপ্তদশ শতাব্দীতে চৈতন্যচরিত কাব্য পাওয়া যায় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুইখানা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু সেইগুলি অনুল্লেখ যোগ্য।

চৈতন্যদেবের গুরুস্থানীয় অদ্বৈত আচার্য এবং তদীয় পত্নী সীতা দেবীর কয়েকখানি জীবন-চরিতকাব্য ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য—

ঈশান নাগর—অদ্বৈত প্রকাশ

হরিচরণ দাস—অদ্বৈত মঙ্গল

নরহরি দাস—অদ্বৈত বিলাস

বিষ্ণু দাস—সীতাগুণকদম্ব

লোকনাথ দাস—সীতা চরিত্র

গ্রন্থ-পঞ্জী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পঞ্চভূত

" " —সাহিত্য

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা

কালিদাস রায়—পদাবলী-সাহিত্য

" " —প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড)

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ

" " —পদাবলী পরিচয়

খগেন্দ্রনাথ মিত্র—বৈষ্ণব রস-সাহিত্য

" " —বিদ্যাপতি

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত—শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে

ডাঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)

প্রমথনাথ তর্কভূষণ—বাঙ্গলায় বৈষ্ণব ধর্ম

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী—বৈষ্ণব কবিতা

বসন্তরঞ্জন রায়—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

ডাঃ উমারাণী রায়—গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম

Dr. H. C. Ray Chaudhuri—Early History of the Vaishnava Sect.

Dr. S. K. De—Early History of the Vaishnava faith and movement in Bengal.

Dr. Bhandarkar—Vaishnavism, Saivism and Minor Religious systems.